চিন্তানায়ক ভূদেব মুখোপাধ্যায়

আশালতা রায় এম-এ, পি-এইচ-ডি

চিরায়ত প্রকাশন
প্রাইভেট লিমিটেড
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ
অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

প্রকাশক
অমলকুমার রায়

মুদ্রক
তিলোত্তমা প্রেস
২৪৪/২, মাণিকতলা মেন রোড
কলকাতা-৫৪

প্রচ্ছদ রমাপ্রসাদ দত্ত

উৎসর্গ

প্রয়াত পূর্ণচন্দ্র রায় ও সুরবালা রায়

জনক জননীর উদ্দেশে—

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	১
পরিচায়িকা	২
জীবনবৃত্ত	৭
সমাজ চিন্তা	২১
সাহিত্য চিন্তা	৬৫
শিক্ষা চিন্তা	৯৫
ভূদেবের গদ্য রচনাশৈলী	১০৮
উপসংহার	১১৫
পরিশিষ্ট—ক	১১৭
পরিশিষ্ট—খ	১২২
পরিশিষ্ট—গ	১২৯
পরিশিষ্ট—ঘ	১৩৮
নির্দেশিকা	১৩৯-১৪৪

জীবনবৃত্ত

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের চারিত্রশক্তির মূল পারিবারিক পরিবেশেই নিহিত ছিল। তাঁর পিতৃপিতামহের ঐতিহ্যপ্রীতি, স্বদেশীয় প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষা এবং আচার অনুষ্ঠান শৈশবেই তাঁর মনে গভীর প্রভাব সঞ্চার করেছিল। একদিকে অ-শাস্ত্রজ্ঞ মূর্খ ধর্মযাজকদের মূঢ়তা, অন্যদিকে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিতদের সাহেবিয়ানা তখন দেশকে একটা সর্বগ্রাসী নৈতিক সংকটে দুর্বল করে ফেলছিল।১ চারপাশের এই বিপর্যয়ের ছবি, অথচ অন্তঃপুরে সনাতন আদর্শের শান্ত অচঞ্চল অনুস্থিতি: অন্তঃপুরে শৃঙ্খলা, শ্রী, আচার-নিষ্ঠা, নিয়মনিষ্ঠা, বাহিরে উচ্ছৃংখলতা, অমিতাচার, অসংযম। তাই সেকালের ইয়ংবেঙ্গলেরা অনেকেই স্ববিরোধিতার শিকার হয়েছেন। এমন কি উগ্র অনেক র‍্যাডিকাল পরে পুরোপুরি রক্ষণশীল হয়ে পড়েছেন।২

স্বভাবতই পিতামহ হরিনারায়ণ সার্বভৌম এবং পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণের প্রখর ব্যক্তিত্ব, অটল গাম্ভীর্য তাঁর শৈশব-বাল্যে মহিমান্বিত মূর্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল। তাঁর পিতা ভরতচন্দ্র শিরোমণি এবং রামজয় তর্কালংকারের সতীর্থ ছিলেন। মাতৃকুলেও সেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। ভূদেব-জননী ব্রহ্মময়ীর দেবদ্বিজে ভক্তি, পতিনিষ্ঠা একটি বিশেষ মূল্যবোধেরই পরিচয় দেয়। গতানুগতিক প্রথানুগত্য থেকে এর মর্যাদা ভিন্ন।

ভূদেবের নিজের উক্তি স্মরণীয়: 'যদি আমার জীবনচরিত লেখাও তাহা হইলে যেন দেখানো হয় যে আমাতে যাহা কিছু ভালো সে সমস্তই আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব হইতেই প্রাপ্ত।'...'গর্ভধারিণী মাতা ব্রহ্মময়ী দেবীতে জীবের প্রতি অপার করুণাপূর্ণ জগজ্জননীকে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেন।' তিন-খণ্ড ভূদেবচরিতে ভূদেবের পিতৃমাতৃভক্তির অনেক নিদর্শন আছে। এছাড়া পারিবারিক প্রবন্ধ এবং আচার প্রবন্ধেও পরিবারস্থ গুরুজনদের কথা বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে।৩

এখানে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের দুটি ভিন্নমুখী ধারা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। একটি বিচারবিশ্লেষহীন স্মৃতিশাসিত লোকাচার ধারা, অন্যটি বিচার বিশ্লেষমুখে স্মৃতিসংস্কার এবং ন্যায়মুখ্যধারা। যাঁরা যজন-যাজন এবং বৃত্তি গ্রহণ করতেন, তাঁরা প্রায় সকলেই অন্ধ লোকাচারের দাসত্ব করেছেন,

তাছাড়া তাঁরা অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী ছিলেন। অন্য ধারাটির যাঁরা বাহক তাঁরা পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু বৃত্তিভোগী শাস্ত্রব্যবসায়ী নন। তার নিদর্শন মেলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিবারে। দুটি পরিবারেই বিদ্যা-চর্চার ঐতিহ্য অনেক পুরোনো, অন্ততঃ তিন পুরুষের। দুটি পরিবারই নৈয়ায়িক, দরিদ্র এবং বৃত্তিজীবী নয়। ভূদেব যেমন তাঁর আত্মচরিত পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ থেকে শুরু করেননি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন চরিতের সূচনাও তেমনি ঠাকুরদাস থেকে নয়। বিদ্যাসাগর রামজয় তর্কভূষণ, রামসর্বস্ব তর্কভূষণের কথা বলেছেন। ভূদেবও হরিনারায়ণ সার্বভৌম এবং তাঁর পিতৃপুরুষের কথা বলেছেন।৪ ভূদেবের পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণও শিক্ষক ছিলেন, ব্যাকরণ স্মৃতি তন্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁর অগাধ অধিকার ছিল। তারাচাঁদ চক্রবর্তী ১৮৩২ সালে মনুসংহিতার যে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন, তার মূলে শিক্ষক বিশ্বনাথের দান বিশেষ উল্লেখ্য। তাঁর দুই কৃতী ছাত্র তারাচাঁদ ও কালাচাঁদ চক্রবর্তী এবং চন্দ্রশেখর দেব বিদ্যোন্মাদ যন্ত্র অর্থাৎ ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও তাঁর কাছে মাঘ, ভারবি, নৈষধ কাব্যের পাঠ গ্রহণ করেন। এই যন্ত্রের অধ্যক্ষরূপে বিশ্বনাথ অনেক প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর নিজেরও গীতার টীকা (অসম্পূর্ণ), শান্তি শতকের টীকা 'বালবোধিনী' প্রকাশিত হয়। বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডের ভাষ্য 'বিশ্বনাথ রামায়ণ' নামে প্রকাশিত হয় (১২৯০)।

বিশ্বনাথ রামায়ণ একটি দুর্লভ পুস্তিকা। ডবল ডিমাই আকারে স্মলপাইকা অক্ষরের পঁচাশি পৃষ্ঠায় বিশ্বনাথ তর্কভূষণ রামায়ণের আদিকাণ্ড মাত্র অবলম্বনে রামায়ণ বৃত্তান্তের আধ্যাত্মিক রূপকার্থ বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হরিনাথ শর্মা স্মৃতিভূষণ পুস্তিকাটির 'বিজ্ঞাপনে' লিখেছেন :

> যে মহাপুরুষের নামে এই চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি জীবনের শেষভাগে মহামুনি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণ গ্রন্থের আধ্যাত্মিক ভাব ব্যাখ্যাত করিয়াছিলেন। সেই ব্যাখ্যার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়া এবং ব্যাখ্যাতার নাম অনুসারে তাহাকে 'বিশ্বনাথ রামায়ণ' নামে অভিহিত করিয়া সম্প্রতি তাহার আদিকাণ্ড প্রকাশিত করা যাইতেছে।'

'বিজ্ঞাপনে' তারিখ আছে ১লা বৈশাখ, ১২৯৭। বইটি 'বিনামূল্যে বিতরণীয়' ছিল। মঙ্গলাচরণে গ্রন্থের আভাস ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। লেখকের বিবৃতি উদ্ধৃত হতে পারে :

> শ্রীরামায়ণ গ্রন্থে বর্ণিত স্থূল স্থূল বিষয় প্রায় সকলেরই যথাশ্রুতার্থজ্ঞাত

আছে। অতএব তদর্থের অনুবাদে বিশেষ যত্ন না করিয়া কেবল বিষয় জ্ঞাপনার্থে সংক্ষেপতঃ প্রকরণানুবাদ সহকারে মহামুনির ছলোক্তি ব্যাকার করণে যত্নবান হওয়াই অভিসন্ধেয়। ফলতঃ গ্রন্থের আরম্ভাবধি সমাপ্তি পর্যন্ত প্রতি প্রকরণে মহামুনির অভিপ্রেত যে সাধনাত্মক বেদান্তভাগ তাহাই প্রকটকরনে এই ক্ষুদ্রমতির অভিলাষ।

তাঁর মতে, মহাভারত বেদের কর্মকাণ্ড এবং রামায়ণ বেদের উপাসনা কাণ্ড। 'সাহিত্য চিন্তা,' পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে, ভূদেব কিভাবে সাগরিকা, রত্নাবলী, উদয়ন, শূদ্রক প্রভৃতি নামের এবং নাট্যঘটনার আধ্যাত্মিক নিহিতার্থ ব্যাখ্যা করেছেন। এখানেও সেই প্রবণতা আরো গভীর বেদান্তজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। দশরথ রাম রাবণ মন্দোদরী কুম্ভকর্ণ দিলীপ প্রমুখেরও আধ্যাত্মিক ব্যুৎপত্তি নির্ধারিত হয়েছে। এমন কি 'মা নিষাদ' প্রভৃতি শ্লোকেরও আধ্যাত্মিক অর্থ নিষ্কাশিত হয়েছে। 'মা লক্ষ্মী বিদ্যাশক্তি (অর্থাৎ যাহার প্রভাবে বাস্তবিক জ্ঞান হয়) সেই শক্তি যাহার অধিষ্ঠানে নিত্য বিরাজমানা থাকেন, হে সেই চিত্তাধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর ঃ' এইভাবে রাবণ মন্দোদরী ফলতঃ কাম এবং স্বেচ্ছাবৃত্তি, সম্মোহ অর্থাৎ কুম্ভকর্ণ ইত্যাদির ব্যাখ্যা আছে।

দুই

ভূদেবের জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। তিনি নিজে তাঁর দিনলিপির এক জায়গায় লিখেছেন : '*I remember to have been 13 years old when I entered the Hindu College and that was the year of the 1st Chinese War. If it was in 1839 I am now 54 years of age.* ১৮৪০ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি এই কথা লিখেছেন। ভূদেব চরিতে তাঁর জন্ম তারিখ দেওয়া হয়েছে ৩রা ফাল্গুন ১২৩১ (১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৮২৫)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যসাধক চরিতমালার অন্তর্গত 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়' শীর্ষক পুস্তিকায় জন্মতারিখের মতান্তর নিয়ে আলোচনা করেছেন। চুঁচুড়া বিশ্বনাথ ট্রাস্টের কাগজপত্র থেকে উপযুক্ত তথ্য সম্ভবত তাঁর হয়ে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রের সাক্ষ্যকেই প্রামাণ্য বলে মেনেছেন। ব্রজেনবাবু

দীনেশচন্দ্র সংগৃহীত ভূদেবের কোষ্ঠী থেকে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮২৭ এবং ১১ই ফাল্গুন ১৭৪৮ শক পেয়েছেন, সুতরাং 'ভূদেব চরিতে' (১ম খণ্ড) মুদ্রিত জন্ম চক্রের সঙ্গে দীনেশচন্দ্র সংগৃহীত কোষ্ঠীর জন্মচক্রের মিল নেই। বিশ্বনাথ নিজেই জ্যোতিষশাস্ত্র ভাল জানতেন, সুতরাং তাঁর একমাত্র পুত্রের কোষ্ঠীতে অবহেলা আশা করা যায় না। অথচ দীনেশ চন্দ্রের প্রাপ্ত কোষ্ঠীতে আছে শক ১৭৪৭-৮। এই রকম দ্বিধাগ্রস্ত উল্লেখ বাঞ্ছনীয় নয়। ১৮৩৯ সালে যদি তিনি ১৩ বছর বয়সে হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়ে থাকেন, তাহলে ১৮৮০ সালের ১লা জানুয়ারী তাঁর বয়স প্রকৃতই ৫৪ বছর। অথচ চাকরিস্থলে লিপিবদ্ধ হিসেবে তাঁর বয়স ৫৬ বছর। হিন্দু কলেজে ভর্তির বিবরণ অনুসারে 'ভূদেব চরিতের' ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮২৫ নির্ভরযোগ্য। অবশ্য স্মৃতিলিখনে কিছু ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। ১৮৮৭ সালে ভূদেবের একদিনের লিপিতে আছে—'গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ৩রা ফাল্গুন আমার ৬৪ বৎসর বয়স আরম্ভ হয়েছে। আমার ১৬ বৎসর বয়সে বিবাহ হয় ১৮৫১ অব্দে গোবির জন্ম হইয়াছিল এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি। ৩২ বৎসর বয়সে আমার মুকুন্দকে পাই। ৪৮ বৎসর বয়সে উহাদের মাতাকে হারাই।' এই নিরিখেও তাঁর জন্ম সন ১৮২৪।২৫ ধরতে হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়দের মতো প্রাচীন পরিবারে কোষ্ঠী রচনার রীতি ছিল এবং পুত্র-পরম্পরায় আসলে পিতৃপুরুষদের কৃত কোষ্ঠীই মেনে চলা হত। বিশেষতঃ ভূদেবের পুত্র-কন্যারা ছিলেন তাঁর মতোই পিতৃভক্ত। সুতরাং 'ভূদেব চরিত' ১ম খণ্ডের কোষ্ঠীকেই নির্ভরযোগ্য মনে হয়।

অবশ্য ভূদেবের জীবনবৃত্ত অনুসরণে সন-বিচার বড়ো কথা নয়। লক্ষণীয় যে চিন্তানায়ক ভূদেবের জীবনে দেখা যায়, তাঁর পিতামাতার আদর্শে অবিচল নিষ্ঠা; চিন্তা প্রণালীতে পরিবার-পরিবেশ থেকে পাওয়া নৈয়ায়িক ঐতিহ্য এবং সনাতন প্রাচ্য-শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও নিষ্ঠা সত্বেও উদার দৃষ্টিভঙ্গী। দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনী' কাব্যে ভূদেবের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য সুন্দর ধরা পড়েছে।

সুভব্য ভূদেব বিজ্ঞ পণ্ডিত সুজন।
গুরুমহাশয়-গুরু শুভ দরশন॥
বঙ্গদেশ সাহিত্যের উন্নতি সাধক।
কাটিছেন সযতনে অজ্ঞান কণ্টক॥
রবি-শশী ছাত্রদ্বয় অতি উচ্চমন।
ক্ষেত্রনাথ ধীর, ধীর শরৎ সুজন॥

প্রথম পঙ্‌ক্তিতে চারটি বিশেষণ আছে—নিছক প্রথাগত প্রশস্তি নয়—বরং সুচিন্তিত নির্বাচন বলা যায়। মানুষ হিসেবে তিনি 'সুভব্য সুজন,' মননের ক্ষেত্রে 'বিজ্ঞ পণ্ডিত'। প্রথম দিকটির পরিচয় মেলে তাঁর সমকালীন ব্যক্তিদের স্মৃতি-চারণে। দ্বিতীয় দিকটির পরিচয় তাঁর গ্রন্থাবলীতে। মধুসূদন, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, রাজনারায়ণ, শিশিরকুমার ঘোষ, নবীনচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতির সাক্ষ্যে ভূদেবের যে ব্যক্তিস্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তার কিছু অংশ উৎকলন করা হল।

১· 'আমি রঘুনাথ ও রঘুনন্দনের ধারায় বাংলায় অত্যুজ্জ্বল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-শ্রেণীর শেষ আদর্শ ভূদেববাবুকে দেখিয়াছি।' (শিশিরকুমার ঘোষ)

২· হাঁসারঙা খাসা বুড়ো মাথা-জ্ঞান-গুড়ে,
নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে।
ইংরিজি শিক্ষার ফুল বাঙালি শিকড়ে,
স্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখরের চূড়ে ঃ
তর্কেতে তক্ষক যেন, তেজে তেজপাতা
শিক্ষাব্রতে সিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা। (হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

৩· আমার আচার্যদেব শক্তি উপাসক শক্তিশালী ভূদেব মুখোপাধ্যায়।
(চন্দ্রনাথ বসু। পৃথিবীর সুখ-দুঃখ) পৃ-১০৮

৪· 'আমরা আমাদের মাতা পিতার মৃত্যু দিবসেই তাঁহাদের স্মৃতিসূচক একাদিষ্ট করিয়া থাকি—ভূদেব বাবুও আমাদের পিতৃকল্প—তিনি আমাদের জ্ঞানদাতা গুরু। শাস্ত্রে আছে—কন্যাদাতান্নদাতা জ্ঞানদাতাস্থভয়প্রদঃ। জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতাচ পিতরঃ স্মৃতাঃ। তাই তাঁহার শ্রাদ্ধ দিবসে আমরা এই শ্রদ্ধা প্রদর্শক অনুষ্ঠান করিতেছি—এবং ইহাই সমীচীন বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

তাঁহাকে জ্ঞানদাতা বলিয়াছি, জ্ঞানদান তাঁহার কুলক্রমাগত ব্যবসায়, তাঁহার পিতৃ পিতামহ পণ্ডিত ছিলেন—শিক্ষাদান তাঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল।

…তিনি হিন্দু সমাজের লোকদিগের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণার্থে প্রবন্ধাদি প্রণয়নদ্বারা যে জ্ঞানবর্তিকা জ্বালাইয়া গিয়াছেন—তাহাই জ্ঞানদাতা গুরুস্বরূপ তাঁহার নাম হিন্দু ধর্ম ও সমাজের অনুরাগী ব্যক্তিগণের নিকটে সুদীর্ঘকাল সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।…

ইংলিশের এম· এ-র সার্টিফিকেট এবং মাথায় টিকি নিয়া শিলং-এ গিয়া যখন এই অদ্ভুত অবস্থার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল, তখন ভূদেববাবুর

প্রবন্ধাবলী অন্যান্য গ্রন্থের সহিত আমার আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছিল।…একাধিক পাঠ রীতিবিরুদ্ধ, কিন্তু ভূদেব অনেকবার পড়িয়াছি। এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতিরূপে স্যার চার্লস এলিয়ট বলিয়াছিলেন: *No single volume in India contains* (আচার প্রবন্ধ) *so much wisedom and none shows such extensive reading, It is the result of the lifelong study of a Brahman of the old class in the formation of whose mind eastern & western Philosophy have had an equal share.*

গ্রন্থ হইতে গ্রন্থকার বড়ো—ভূদেবের গ্রন্থাবলী অপেক্ষা স্বয়ং ভূদেব আমাদের নিকট সমধিক আদরের পাত্র। তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে আমরা যে সকল জিনিস পাই, সে সকলের মূল তাঁহার স্বকীয় জীবন। তাঁহার উপদেশাবলী অনেক নিজ জীবনের পরীক্ষিত সত্য বলিয়াই এগুলি আমাদের নিকট এত হৃদয়গ্রাহী। (পদ্মনাথ ভট্টাচার্য)

ব্রাহ্মণ সমাজ (১৩২৮) পৌষ-মাঘ পত্রিকায় বিভূতি বিদ্যাভূষণ, এম.-এ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ত্যাগ ও শিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন।

'যখন বিকৃত শিক্ষার ফলে দেশের যুবকবৃন্দ বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া ধর্মান্তর গ্রহণ পূর্বক বিজাতীয়ভাবে আত্মবিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন দিগ-ভ্রান্ত নাবিকের মত বিভ্রান্তমতি বঙ্গবাসীগণের পথপ্রদর্শক ধ্রুবতারার ন্যায় বঙ্গীয় সমাজাকাশে ভূদেব উজ্জ্বল হইয়া বিকাশ লাভ করিয়াছিলেন। তখন বঙ্গবাসী উন্মুখ হইয়া ঐ প্রতিভাপ্রভা সমুজ্জ্বল ভূদেব ধ্রুব জ্যোতিষ্কের প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া দেখিল, উহার সৌম্য স্নিগ্ধ অথচ তেজোভাস্বর মূর্তি, দেখিল ইহা অবিকৃত ও অবিচলিত একনিষ্ঠতা যাহা দ্বারা তিনি বিবিধ বিপ্লব ও বজ্রাঘাতের মধ্যে পিতৃপিতামহ-অচরিত প্রাচীনধারা অটল ও সুদৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিয়া-ছিলেন। তাঁহার সেই আদর্শ পুণ্য অবিকৃত মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া পথ-উদ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বপথে ফিরিবার উদ্যোগ করিল।…

সুতরাং প্রাচীন জাতীয়ভাবের ও সনাতন হিন্দু ধর্মের অক্ষুণ্ণতা বিধান কল্পে স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব সমাজের যে কল্যাণ সাধন করিয়াছে, তাহা প্রত্যেক সুধী সামাজিকের পক্ষে অবশ্য আলোচনীয়।'

তিন

মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক জ্ঞানেশ চন্দ্র শাস্ত্রী বিদ্যাদিত্য 'ভূদেব নির্বাণ' নামে একটি কাব্য লেখেন (১৩৩৫)। 'ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি.আই.ই.

মহোদয়ের পারলৌকিক লীলা অবলম্বনে লিখিত।’ কাব্যটি বারোটি সর্গে বিভক্ত। সর্গগুলির নামকরণ নিম্নরূপ—

প্রথম সর্গ—বঙ্গবিলাপ—২৩টি স্তবক।

দ্বিতীয় সর্গ—সংসার ও স্বর্গ—২৭টি স্তবক।

তৃতীয় সর্গ—প্রবৃত্তিমার্গ কথন (অযোধ্যা ও চিতোর) ২২টি স্তবক।

চতুর্থ সর্গ—নিবৃত্তিমার্গ কথন। (লঙ্কা ও রাবণ) ৩৫টি স্তবক।

পঞ্চম সর্গ—ধর্মরাজ পুরী গমন। ২৩টি স্তবক।

ষষ্ঠ সর্গ—পাপ পরিণাম বোধন। ২২টি স্তবক।

সপ্তম সর্গ—পত্নী সম্মেলন। ২৬টি স্তবক।

অষ্টম সর্গ—দিব্যোপস্থান। ২৯টি স্তবক।

নবম সর্গ—ইন্দ্রাভিনন্দন। ৩২টি স্তবক।

দশম সর্গ—ব্রহ্মসন্দর্শন। ৩৩টি স্তবক।

একাদশ সর্গ—বিষ্ণু সম্ভাষণ। ২৮টি স্তবক।

দ্বাদশ সর্গ—নির্বাণ। ৪৫টি স্তবক।

কাব্যের কয়েকটি অংশ এখানে উৎকলন করা যেতে পারে—

ক. তর্করূপ সর্পগণে ভয়াকুল শাস্ত্রবনে
সদর্থপ্রসূন রাশি বল কে তুলিয়া
বিজ্ঞান তন্তুর বলে সাহিত্যানুরাগী বলে
মালা গাঁথি এবে আর দিবে পরাইয়া ? বঙ্গবিলাপ। ১৭ স্তবক।

খ. পিতা গুরু সখা প্রায় স্নেহে শাস্ত্রে সুখে হায় !
তোমা সম সন্তানের সুকোমল মন,
জ্বলানল সোহাগায় বিশুদ্ধ কাঞ্চন প্রায়
বিমল করিতে পারে, বল কোন জন ? ঐ। ২০

নবম সর্গে আছে, গঙ্গাদেবীর সঙ্গে ভূদেবের ইন্দ্রসমীপে যাত্রা, শচী ও ও ইন্দ্রের ভূদেব অভ্যর্থনা, স্বর্গে চির-অবস্থান জন্য ইন্দ্রের অনুরোধ, ভূদেবের প্রত্যুত্তর ও ইন্দ্রের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি। একাদশ সর্গের চার থেকে তের পর্যন্ত স্তবকে ভূদেবের বিষ্ণু প্রশস্তি। দ্বাদশ সর্গে দশমহাবিদ্যার পুরাণসম্মত বর্ণনা। (চার থেকে একত্রিশ স্তবক পর্যন্ত) শেষ স্তবকে ভূদেবের ব্রহ্মত্ব লাভ বর্ণিত হয়েছে।

শান্তিময় পরমেশ :
শান্তিপূর্ণ কর দেশ ;

না চাহে সেবিতে আজ প্রভাত পবন ;
না চাহে শুনিতে কিংবা বিহগ কুজন,
পরম পুরুষে স্মরি কিংবা আজ ত্বরা করি
না চাহে হেরিতে সেই তপন উদয়
ভূদেব—ব্রহ্মত্ব লাভ আজ ব্রহ্মময়।

কাব্যটির রচনাশৈলী অনেকাংশে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্ন প্রয়াণের মতো। 'ভূদেব নির্বাণ কাব্য'-এর কাব্যত্ব বিচার আমাদের লক্ষ্য নয়। সমকালীন বাঙালী সমাজে ভূদেবের মৃত্যু কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল এবং ভূদেব-ব্যক্তিত্ব কেন তাঁদের কাছে পূত-স্মরণীয় মনে হয়েছিল, তার কিছু পরিচয় লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। 'নরদেব ভূদেব'-কে স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রও অভিনন্দন জানিয়ে তাঁকে চিরকাল স্বর্গবাসের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কিন্তু ইন্দ্রের অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের ঘটনাটিও তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের সামাজিক কল্যাণকামী ভূদেব একান্তভাবে পার্থিব মানুষ, মানুষের আদর্শ।

ভূদেবের বিচিত্র কীর্তি জীবনের ঘটনাপঞ্জী সংক্ষেপে বিবৃত করা হল।

১. ১৮৩৫ সালে মাত্র নয় বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ ; সাহিত্য শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন।

২. ১৮৩৭ সালে রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত এবং ওর্ণচন্দ্র মিত্র পরিচালিত ইণ্ডিয়ান একাডেমিতে প্রবেশ ; পরে নবীন মাধব দেব ও ভোলানাথের স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা ; মোট দুই বছর।

৩. ১৮৩৯ সালে হিন্দু কলেজ জুনিয়ার স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে প্রবেশ। তখন জুনিয়ার স্কুলে ত্রয়োদশ থেকে ষষ্ঠ পর্যন্ত আটটি শ্রেণী ছিল। সপ্তম শ্রেণীতে তাঁর সতীর্থদের মধ্যে ছিলেন মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক, বংকুবিহারী দত্ত, শ্যামাচরণ লাহা।

৪. ১৮৪১ সালে হিন্দু কলেজের সিনিয়র স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে প্রবেশ ; ঐ বছরে আগষ্ট মাসে পঞ্চম শ্রেণী থেকে বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় স্থান ও আট টাকা বৃত্তি লাভ, এলোকেশীর সঙ্গে বিবাহ।

৫. ১৮৪২ সালে মধুসূদন ও শ্যামাচরণের সঙ্গে ভূদেবের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নতি ; রামগোপাল ঘোষ আহুত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় 'স্ত্রীশিক্ষা' বিষয়ে ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখে দ্বিতীয় স্থান লাভ, প্রথম স্থান অধিকার করেন মধুসূদন।

সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা এবং চল্লিশ টাকা বর্ধমান রাজবৃত্তি লাভ।

৬. ১৮৪৩ সালে প্রথম শ্রেণীতে পাঠ এবং বৃত্তিলাভ।

৭. ১৮৪৫ সালে হিন্দু কলেজ ত্যাগ।

৮. ১৮৪৬ সালে রাধাকান্ত দেব হরিমোহন সেন ও দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর পরিচালিত হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ, মতভেদের দরুণ এক বছর পরে ঐ পদে ইস্তফা।

৯. ১৮৪৭ সালে ফরাসী চন্দননগরে চন্দননগর সেমিনারী নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা, সেখানেই শিক্ষাব্রতী ভূদেবের যথার্থ আত্মপ্রকাশ; কিন্তু পারিবারিক অর্থ-কৃচ্ছ্রতার জন্য এক বছর পর সরকারী চাকুরী গ্রহণ।

১০. ১৮৪৮ দ্বিতীয় শিক্ষক, কলকাতা মাদ্রাসা। ১৮৪৯-প্রধান শিক্ষক হাওড়া স্কুল।

১৮৫৬- প্রধান শিক্ষক হুগলী নর্মাল স্কুল।

১৮৬২-সহকারী স্কুল পরিদর্শক (অস্থায়ী) সেণ্ট্রাল ডিভিসন।

১৮৬৮-সহকারী স্কুল পরিদর্শক, হুগলী।

১৮৬৯-১৮৭৩-স্কুল পরিদর্শক, উত্তর কেন্দ্রীয় বিভাগ

১৮৭৪-বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের তৃতীয় শ্রেণীর অফিসার পদে উন্নতি।

১৮৭৫-পশ্চিম অঞ্চলের স্কুল পরিদর্শক (দ্বিতীয় শ্রেণীর বিভাগীয় পদে উন্নয়ন) পূর্বাঞ্চলের স্কুল পরিদর্শক—যুগপৎ পশ্চিমাঞ্চলের পদেও বহাল।

১৮৭৬-বেহার অঞ্চলের স্কুল পরিদর্শক।

১৮৭৭-বেহার অঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমাঞ্চলের স্কুল পরিদর্শক (প্রথম শ্রেণীর অফিসার পদে কার্যরত)

১৮৮০-ভূদেব প্রাক-অবসর ছুটিতে যান।

১৮৮২-গভর্নরস কাউন্সিলের সদস্য—কুড়িজন সদস্য বিশিষ্ট উইলিয়ম হাণ্টার কমিশনের সদস্যপদ লাভ।

চার

শিক্ষাব্রতী ভূদেব মুখোপাধ্যায় শিক্ষাব্রতী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুগামী ছিলেন।৬ দুজনেই সরকারী শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থেকে শিক্ষা বিস্তারের

আদর্শকে যথাসাধ্য বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলিতে যোগ্য শিক্ষক তৈরীর জন্য বিদ্যাসাগর প্রায় দুশো নর্মাল স্কুল স্থাপনা করেন। বিদ্যাসাগর অবসর নেবার পর সেগুলির সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে থাকে। অক্ষয় কুমার দত্তের মতো ভূদেবও নর্মাল স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বিদ্যাসাগর শিক্ষা বিভাগের কর্তা জি· টি· মার্শাল সাহেবকে বহু প্রগতিশীল শিক্ষা সংস্কারে সহ-যোগিতা করেন; ভূদেবও নানা সময়ে সরকারের শিক্ষা বিভাগকে পরামর্শ দেন। হাণ্টার কমিশনের রিপোর্ট মূলতঃ তাঁর উপস্থাপিত তথ্য ও মন্তব্যের ভিত্তিতেই তৈরী হয়েছিল। কলকাতা, হাওড়া, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলের যেখানে যখন স্কুল-পরিদর্শক ছিলেন, তখনি সেখানকার শিক্ষা-সংস্কারে ও শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হয়েছেন। বিদ্যাসাগর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেন সোমপ্রকাশ, ভূদেবের এডুকেশন গেজেটেও দ্বারকানাথ চক্রবর্তীর 'হাইকোর্টের নজীর,' পুলিনবিহারী ভাদুড়ীর 'বাণিজ্যবার্তা,' হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশাত্মবোধক কবিতা 'ভারতবিলাপ' এবং 'ভারতসঙ্গীত' ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এডুকেশন গেজেটের প্রথম সংখ্যায় ভূদেব পত্রিকার উদ্দেশ্যে বিবৃত করেন:

> 'কোন মত, কোন দল, কোন পক্ষ অবলম্বন করার আমাদিগের ইচ্ছা নাই। সকল মতেই, সকল দলেই, সকল পক্ষেই কিছু সত্য এবং কিছু মিথ্যা থাকে কিছুতেই সত্য অথবা মিথ্যা অমিশ্রভাবে থাকে না। আমরা সত্যের দিকেই ভাবিতে চেষ্টা করিব অসত্য ভিন্ন আর কিছুরই ভয় করিব না—কারণ আশৈশব আমাদিগের এই মহাবাক্যে বিশ্বাস আছে 'সত্যমেব জয়তে'। লক্ষণীয় যে, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রিক 'মটো' রূপে 'সত্যমেব জয়তে' গৃহীত হয়েছে। ভূদেবের স্বদেশবোধ ও জাতীয় আদর্শ যেন ভবিষ্যত ভারতের বাণীকে পূর্বাহ্নেই চয়ন করে রেখেছিল।

পাঁচ

রসসৃষ্টির প্রেরণায় ভূদেব গ্রন্থ রচনা করেন নি; সাহিত্যে তিনি কর্মযোগী, ভাবযোগী নন। 'এডুকেশন গেজেটে' সম্পাদনার পূর্বেই তিনি ১৮৬৪ সালে 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার' সম্পাদনা করেছিলেন। তাতে বোঝা যায়, সব

বিষয়ে জাতিকে সুশিক্ষিত করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। 'ফলতঃ শিক্ষা শব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করিয়া লইলে শিক্ষা দর্পণের মধ্যে লিখা যাইতে না পারে এমন কথাই নাই। জর্মন দেশীয় একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন যে, শিক্ষা গ্রহণ করাই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য, মনুষ্যদেহ ধারণের আর দ্বিতীয় প্রয়োজন নাই।' পল্লী গ্রামের 'কেবল দলাদলি বন্ধ' করার মানসেই তিনি 'প্রামাণিক সংবাদ পত্র সমস্ত হইতে ফলোপধায়ক ও শুশ্রূষাজনক' সংবাদ পরিবেষণ করে উপবাসক্লিষ্ট ব্যক্তিকে জ্ঞানের পর্যুষিতান্ন দানের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর মতে এতেও 'পুণ্য আছে'।

সরকারী অর্থে 'এডুকেশন গেজেট' সম্পাদনার সময় তাঁর সেই পুণ্যব্রত পালন করা সহজ হয়েছিল। ১৮৫৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে' সচেতনভাবেই তিনি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গুরুজনবর্গের 'কর্তব্যতা' আলোচনা করেছেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পুরাবৃত্তসার, ইংলণ্ডের ইতিহাস, ক্ষেত্রতত্ত্ব, রোমের ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষক-ভূদেবের প্রদর্শিত পাঠ্য গ্রন্থের আদর্শ। তাঁর সুযোগ্য শিষ্যরূপে চন্দ্রনাথ বসু, রামগতি ন্যায়রত্ন, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিরা স্বাধীন মনন-সমৃদ্ধ গ্রন্থের পাশাপাশি পাঠ্য বই লিখেছেন। সুকুমারমতি শিক্ষার্থীদের জন্য বই লেখা এখনকার মত লোভনীয় বিদ্যাবাণিজ্যের অংশ ছিল না। তখনো আদর্শ পাঠ্য গ্রন্থের মান নিরূপিত হয়নি। যাঁদের চেষ্টায় সেই মান প্রতিষ্ঠিত হয়, ভূদেব তাঁদের অন্যতম পুরোধা-ছিলেন—বিদ্যাসাগরের পরেই এখানে তাঁর স্থান।

কেবল বাংলা ভাষায় বাঙালী শিক্ষার্থীদের জন্য নয়, তিনি যখন বিহারে স্কুলপরিদর্শক ছিলেন, তখন হিন্দী ভাষী শিক্ষকদেরও সরল সুবোধ্য ভাষায় সীমিত পরিসরে পাঠ্যগ্রন্থ লেখার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন। ছুটুরাম তেওয়ারী, শিবনারায়ণ ত্রিবেদী, বদ্রিনাথ তেওয়ারির রচনা তার নিদর্শন।

পরিশেষে বলা যায়, 'উনিশ শতকে যে সব মনীষী বাঙালী কল্পনায় অখণ্ড ভারতভূমি দর্শন করিয়াছিলেন, কল্পনার সত্যকে বাস্তব সত্যে পরিণত করিয়া-ছিলেন, ভূদেব নিঃসন্দেহে তাঁহাদের অন্যতম।'৭

পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণের মৃত্যুতে 'সোমপ্রকাশ' যা লিখেছিলেন, পুত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পর্কেও তা সমান প্রযোজ্য :

'তিনি এইকালেও প্রাচীন ধর্মকে মূর্তিমান রাখিয়াছিলেন। কি সংস্কৃত

ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কি ইংরাজী ব্যবসায়ী নব্য সম্প্রদায়ের লোক, সকলেই তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এবং তাঁহার তেজোগর্ভ সসার বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিমান এবং স্বয়ং ধর্মকার্যে উত্তেজিত হইয়া যাইতেন। তাঁহাতে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য ধর্মশাস্ত্রজ্ঞগুণ সর্বতোভাবে বিদ্যমান ছিল।'৮

১। ভূদেব যখন কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন তিনি পাশ্চাত্যভাবে সুশিক্ষিত ছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার তাঁহার পুরোভাগে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের নিকটে পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি পাশ্চাত্য বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ পাশ্চাত্যশিক্ষায় তাঁহার বুদ্ধিবিপর্যয় ঘটে নাই। তাঁহার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোতে ভাসমান হইয়া পাশ্চাত্যরীতিনীতির অনুবর্তন করিয়াছিলেন। এই সময় যখন পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের অত্যদ্ভুত কার্যকলাপ তাঁহাদের দৃষ্টি পথবর্তী হইল, শেক্সপিয়র যখন তাঁহাদের হৃদয়ে অচিন্ত্যপূর্ব ভাবস্রোত প্রবাহিত করিলেন, মিলটন যখন তাঁহাদিগকে কল্পনার উচ্চতর গ্রামে তুলিয়া দিলেন, বেকন যখন তাঁহাদের হৃদয় চিন্তাপ্রবাহে আন্দোলিত করিয়া তুলিলেন, গিবন যখন সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় তাঁহাদের মানসপটে অতীত ঘটনার বিচিত্র চিত্রজাল অংকিত করিলেন, তখন তাঁহারা সর্বাংশে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। দুর্দমনীয় অভিনব ভাব-প্রবাহের অভিঘাতে প্রথমে তাঁহাদের কেহ কেহ উচ্ছৃংখলার পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই অভাবনীয় পরিবর্তনের সময়ে ভূদেব অচলশ্রেষ্ঠের ন্যায় অবিচলিত ছিলেন।

—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০১, পৃ-৯৭।

২। দ্রঃ রাজনারায়ণ বসুর আত্মজীবনী, সেকাল ও একাল।

৩। 'পিতামহ ঠাকুর' অধ্যায়, পারিবারিক প্রবন্ধ।

৪। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক এই দুই মনীষীর মধ্যে অমিলের ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য: 'ভূদেব ও বিদ্যাসাগরের চেহারার অমিল অত্যন্ত স্পষ্ট, কিন্তু অমিলের ঐ শেষ নয়, সূত্রপাত। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি দুজনেরই ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে দুজনের মত ভিন্ন।'

বিদ্যাসাগর বেদান্ত দর্শনকে ভ্রান্ত বলিয়াছিলেন, ভূদেব বেদান্তদর্শন শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া প্রভূত অর্থের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।'

৫। ভূদেবের প্রতিবেশী এবং অনুরাগী, বঙ্গদর্শনের অন্যতম প্রধান লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে।

'আজ টি· পালিত মহাশয় তাঁহার স্বোপার্জিত সমুদায় সম্পত্তি বিদ্যাশিক্ষার্থ মুক্তহস্তে দান করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এত বড় দান বাঙ্গালায় এই প্রথম। কিন্তু বিদ্যাদানের জন্য উপার্জিত অর্থের সমুদায় বা অধিকাংশ দানের উদাহরণ,

ইতঃপূর্বে ভূদেববাবুই দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের দেশ দুর্ভাগ্য। আমরা সুযোগ ব্যবহার করিতে জানি না। এই দেখনা, একে আমাদের দেশের সাধারণ লোকের টাকা নাই। যাহাদের টাকা আছে, তাহারা সদ্‌কার্য কাহাকে বলে জানে না। সুতরাং সাধারণের উপকারের জন্য, সদ্‌কার্যে টাকা দিবার লোক পাওয়া যায় না। যদিও বা এমন দুই-একজন পাওয়া যায়, যিনি সদ্‌কার্যে মুক্তহস্তে, তবে অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাদিগের প্রদত্ত অর্থ এমনভাবে অপব্যয় হয়, যাহাতে যে-কোন লোকের প্রাণে ব্যথা লাগে। ভূদেববাবু লাইব্রেরীর জন্য টাকা গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন। গচ্ছিত টাকার সুদ হইতে বই কেনা হইতেছে। কিন্তু লাইব্রেরীর অবস্থা শোচনীয়। বই ব্যবহার করিবার লোক নাই। ঘরটি কতকাল খোলা হয় নাই, হয়ত ঘরটির মধ্যে জঙ্গল হইয়াছে। এইরূপভাবে টাকা নষ্ট হইবার জন্যই কি বুকের রক্ত দিয়া উপার্জন করা টাকা ভূদেববাবু দিয়া গিয়াছেন? আমরা উপযুক্ত নই, অপরের দোষ দিয়া কি হইবে?'

—সুরেন্দ্রনাথ মিত্র অনুলিখিত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের জীবনস্মৃতি। 'প্রবাহিনী' বৈশাখ, ১৩২২।

৬। স্যার জর্জ ক্যাম্প্‌বেল যখন বড়লাট, তখন প্রাথমিক শিক্ষাসম্প্রসারণের জন্য জমির ওপর শিক্ষাকর প্রবর্তনের প্রস্তাব ওঠে। ভূদেব সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। ছোটলাট স্যার অ্যাশ্‌লে ইডেনের পত্র দ্রষ্টব্য। (ভূদেব চরিত, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৫) চৌকিদারি আইনের সামান্য সংস্কার করে তিনি তার সঙ্গে পাঠশালা বিস্তারের প্রসঙ্গটি জুড়ে দেন। প্রত্যেক গ্রামে যাতে চৌকিদার নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠশালা প্রবর্তন ও গুরুমহাশয় নিয়োগেরও ব্যবস্থা হয়।

এ বিষয়ে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের সাক্ষ্য:

'ইতিপূর্বে লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর গ্রাণ্টসাহেব প্রজাসাধারণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বার্ষিক ৩০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। এ পর্যন্ত সে টাকা ব্যয়িত হয় নাই। এক্ষণে মেড্‌লিকট ভূদেববাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া যথোচিতরূপে সেই টাকার দ্বারা পাঠশালা সমুদয় স্থাপিত করিলেন।'

—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। পৃ-২৭।

৭। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, ভূমিকা, ভূদেব রচনা সম্ভার।

৮। ভূদেব চরিত, প্রথম খণ্ড, ২য় অধ্যায়।

সমাজচিন্তা

সমাজতত্ত্ব (*Sociology*) ও সমাজবিজ্ঞান (*Social Science*) শব্দদুটি বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে উনিশের শতক থেকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালী পৌরাণিক বিশ্বাস এবং দশকর্ম সংস্কারের মধ্যেই মোটামুটি পরিতৃপ্ত ছিল। বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথাই সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করত। মাঝে মাঝে উচ্চ বর্ণের পীড়ন বা অশিক্ষাজনিত কারণে অনাচার-বিশৃঙ্খলা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেও শ্রীচৈতন্য বা কবীর-দাদূর মত মানবপন্থী সন্ত সংস্কারকদের আবির্ভাব হত। সাধারণ মানুষেরও বিশ্বাস ছিল এই পথেই বর্ণবৈষম্য সমস্যার সমাধান মিলতে পারে।

কিন্তু রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি ধর্মনীতির মত সমাজকেও যে কয়েকটি মৌল প্রবণতা এবং মূল সূত্রের সমষ্টিরূপে দেখা চলে, দেশভেদ সত্ত্বেও মানব সমাজের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং সভ্যতা-লক্ষণ যে অনেকাংশে একই নিয়মাবলীর অধীন, এ সত্য উনিশের শতকের আগে য়ুরোপেও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। 'সমাজ বিজ্ঞান' কথাটি যথার্থ মর্যাদা পেয়েছে অগস্ত কোঁতের (১৭৯৮-১৮৫৭) রচনায়। রুশো১ হবস্২ লক্৩ 'সামাজিক চুক্তি' বিষয়ে মতবাদ প্রচার করেছেন, কিন্তু সামাজিক চুক্তির ঐতিহাসিক নজীর মেলেনি এবং চুক্তির পূর্ববর্তী স্তরের ব্যাখ্যাতেও চুক্তিপন্থীরা ভিন্নমত।

১৮২২ সালে প্রকাশিত হয় অগস্ত কোঁতের 'সমাজ সংস্কারের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' (***A plan for the scientific works necessary to reorganize society***)। ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পরে ডেভিড হিউম৪, সেণ্ট সাইমন৫ প্রমুখ সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণীকে নতুন সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে চাইলেন। এ বিষয়ে জনৈক বিদগ্ধ সমালোচকের উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

> 'এতদিন ধর্ম চলিতেছিল ধর্মের পথ ধরিয়া, বিজ্ঞান চলিতেছিল স্বতন্ত্র ধারায়। ধ্রুববাদ চাহিল উভয়কে একত্র করিতে, ধর্মকে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড় করাইতে। এইজন্য ধ্রুববাদের প্রভাবে খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে আবার নূতন করিয়া সমাজসেবার একটু স্থান হইল, সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা যে প্রয়োজন তাহা চিন্তাশীল ধার্মিকেরাও স্বীকার করিয়া

লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুববাদীরাও ধর্ম সম্বন্ধে নূতন বাণী শুনাইলেন— ***Religion of Humanity***-র কথা বলিলেন। সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে নবযুগকে ধর্মের কথাও জানিতে হইবে, তবে নবযুগের ধর্ম হইবে মানবতার ধর্ম. ***Religion of Humanity*** হইবে ইহার নাম।' (প্রিয়রঞ্জন সেন। কৃষ্ণনগর কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৯৪৮)।

এখানে বলা প্রয়োজন 'ধ্রুববাদ'৬ শব্দটি কোঁতের 'পজিটিভিজম্' কথারই বাংলা পরিভাষা রূপে গৃহীত হয়েছে। ধ্রুববাদী চিন্তায় ঈশ্বর ও পরলোক নেই, যাজকতন্ত্রের অপরিহার্যতা স্বীকৃত, গণিতের স্থান সর্বাগ্রে, তারপর রসায়ণ ও পদার্থবিদ্যা, সব বিজ্ঞানের চূড়ান্ত পরিণতি সমাজবিজ্ঞানে। বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ সম্বন্ধ দিয়েই সমাজপ্রথার ভালোমন্দ বিচার করতে হবে। ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করে কোঁতপন্থীরা দেখালেন, পৃথিবীর কোন সমাজই স্থানু হয়ে নেই। গ্রীস রোম মিশর প্রভৃতি দেশের সমাজ বদলেছে। তার কারণ একাধিক বিদেশী আক্রমণ. অন্য ধর্মের চাপ ইত্যাদি। কিন্তু আসল কথা, কোন সমাজই অনড় অপরিবর্তনীয় নয়। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। সুতরাং ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে যাঁরা সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষাসংস্কারে ব্রতী হলেন, তাঁরা পাশ্চাত্ত্য সমাজবিজ্ঞান চর্চাতেও স্বভাবত উৎসাহী হলেন। বেথুন সোসাইটিতে একটি 'সমাজবিজ্ঞান' (***Sociology***) নামে শাখা ছিল। আলেকজাণ্ডার ডাফ এবং পরে রেভাঃ জেমস লঙ্৭ সমাজবিজ্ঞান শাখার সভাপতি (১৮৫৯) ছিলেন। উনিশের শতকেই ইংলাণ্ড ফ্রান্সের সঙ্গে তাল রেখে মহেন্দ্রলাল সরকার কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদ (***Bengal Social Sciences Assoctation*** (১৮৬৭)। বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য ছিল—

> ***'To promote the development of social progress in the Presidency of Bengal by uniting Europeans and nations of all classes. in the collection, arrangement, and classification of facts bearing on the social, intellectual and moral condition of the people'***

যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ এইসব সভা-সমিতির সঙ্গে জড়িত হয়ে নিয়মিত সমাজের বিবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। অক্ষয়চন্দ্রের বিতর্কমূলক আলোচনা 'হিন্দুর পরিণয় প্রথা' (১৮৮২) সমাজবিজ্ঞান

পরিষদেই পঠিত হয়েছিল। রেভাঃ লালবেহারী দের বেঙ্গল ম্যাগাজিন, বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন, অক্ষয়চন্দ্রের সাধারণী প্রভৃতি পত্রিকায় সমাজতত্ত্ব, সমাজের পরিবর্তন, প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব নিয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ভূদেব নিজে বেথুন সোসাইটি বা সমাজবিজ্ঞান পরিষদের সদস্য ছিলেন না। কিন্তু এইসব আলোচনা ও মতাদর্শের সঙ্গে তাঁর সনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁর সমাজচিন্তায় এ সবের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। তিনি হেগেল, সোপেনহৌর, ডারুইন, সেণ্ট সাইমন, কোঁত (কোম্‌টি), হার্বার্ট স্পেন্সার, রুশো-হবস্-লক প্রভৃতি সম্পর্কে কোথাও স্পষ্ট, কোথাও বা প্রচ্ছন্ন উল্লেখ করেছেন।

কোঁতের মতবাদ বিষয়ে ভূদেবের সমালোচনা সংক্ষেপে নীচে লিপিবদ্ধ করা হল।

'বৈজ্ঞানিকের মত এবং ধর্মমত উভয়কেই দৃষ্টিপথে রাখিয়া এবং ইতিবৃত্ত শাস্ত্রের বিশেষ সহায়তা গ্রহণ করিয়া অশেষবিৎ অগষ্ট কোম্‌টি নবজাতির ভবিষ্যৎদশার বিচারপূর্বক একটি নব্য মতের কল্পনা করিয়াছেন। কোম্‌টির গ্রন্থসমূহে সমাজতত্ত্বের নিগূঢ় বিচার এবং ভবিষ্যৎ ঘটনার বহুল কথা দৃঢ়-রূপে ব্যক্ত আছে। তাঁহাকে ইউরোপীয় সমাজতত্ত্ব-শাস্ত্রের সংস্থাপয়িতা বলিয়াই ধরা হয়। তাঁহার মতের সহিত প্রচলিত হিন্দু এবং বৌদ্ধ প্রণালীর কতকটা মিল আছে, এবং ইংরাজী শিক্ষিত সুবোধ এবং সুশীল কতিপয় দেশীয় লোক এক্ষণে কোম্‌টির মতবাদ গ্রহণপূর্বক উহার প্রচারের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। এইসকল কারণে কোম্‌টির স্থূল স্থূল কথাগুলির সবিশেষ উল্লেখ করা আবশ্যক। কোম্‌টি বলেন (১) পৃথিবীতে ধর্মভেদ রহিত হইবে, (২) বর্ণভেদ রহিত হইবে, (৩) যুদ্ধ বিগ্রহ উঠিয়া যাইবে, (৪) বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা বন্ধ হইবে, (৫) শাসন এবং শিক্ষাকার্য পবিত্রাত্মা পুরোহিতদিগের মতানুসারে চলিবে, (৬) জনগণ সর্বত্র যাজক, শাস্তা ও শ্রমজীবী এই তিনশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকিবে, এবং (৭) অভ্যাসগুণে পরার্থপরতা মানব হৃদয়ে স্বার্থপরতার আসন গ্রহণ করিবে।'

(ভবিষ্যৎ বিচার—সাধারণকথা। সামাজিক প্রবন্ধ)

কোঁতের এই সাতটি মূলসূত্রই ভূদেবের মতে অভিনবত্বহীন, কয়েকটি সূত্র খণ্ডনযোগ্য। প্রথমতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে কোঁতের অস্বীকৃতি ভূদেবকে অসন্তুষ্ট করেছিল। তাঁর মতে ঈশ্বর বিচারাধীন বিষয়ই নয়। কিন্তু অক্ষয়-

কুমার দত্ত তাঁর বহুপূর্বেই কোঁতের যুক্তিসম্মত গণিত পন্থায় দেখিয়েছেন শ্রম+বৃষ্টি+ঈশ্বর=শস্য এবং শ্রম+বৃষ্টি=শস্য, সুতরাং ঈশ্বর এখানে ধর্তব্যই নয়। ধ্রুববাদী সমাজচিন্তায় নরদেবতার পূজাই একমাত্র ধর্ম। ভূদেব যতই সর্বেশ্বরবাদ বিষয়ে আশাবাদী হন, চিরন্তন মাতৃমূর্তির সঙ্গে মানবতা-দেবীকে মিলিয়ে দিয়ে তিনিও পরোক্ষত তাকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন—'ব্যাপক মানব সমাজের প্রতিরূপ স্বরূপ শিশুক্রোড়স্থা একটি নারীমূর্তি—যথা, গণেশ জননী অথবা যিশু-মেরী, অথবা হোসেন-ফতেমা।'

ভূদেবের প্রশ্ন, 'কাল্পনিক একটি নরদেব পূজায় মানববুদ্ধি এবং মানব-হৃদয়ের তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা কোথা?' কিন্তু অন্যত্র তিনি ইসলাম প্রবর্তক হজরত মহম্মদকেও 'নরদেব' বলেছেন। পুষ্পাঞ্জলিতেও ব্যাসদেবের মুখে একাধিক নরদেবের স্বীকৃতি আছে।

ধর্মভেদ ও বর্ণভেদ সম্বন্ধে ভূদেবের বক্তব্য—বর্ণভেদই ভারতীয় হিন্দু সমাজের ভিত্তি, সেটি লোপ পেলে ভারতীয় সমাজই লুপ্ত হবে, ধর্মভেদ সত্ত্বেও অবিদ্বেষী ঐক্যমনোভাব বৃদ্ধি পাবে। একদেশ চেতনায় ধর্মাচরণ পার্থক্যের তীব্রতা নষ্ট হবে।*

'পৃথিবী এবং তজ্জাত ভোগ্যবস্তুর সসীমতা' থেকেই যুদ্ধবিগ্রহের উদ্ভব। ধনবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ভাষ্য বিশ শতকের পূর্বে য়ুরোপেও প্রচলিত হয়নি। তথাপি ভূদেব মূল কথাটি ঠিক ধরেছিলেন। পোপের কর্তৃত্ব গ্রীক আমফিকৃটিয়োনিক সভার অনুরূপ 'শক্তি সামঞ্জস্যের জন্য' বহু মিলনসভা গঠিত হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে। 'যখন বীজ আছে, তখন কালে ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে।' তবে ভূদেবও 'লীগ অফ নেশনস্' 'ইউনাইটেড নেশনস্ অরগানাইজেশনস্' ধরনের সংস্থার শুভ প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন।

বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন অথবা শাসন ও শিক্ষাকার্যে পুরোহিত-প্রাধান্য সম্বন্ধে এখানে বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ এ বিষয়ে কোঁত্ এবং ভূদেব

*'বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা এক দেশবাসী হইলে ক্রমশঃ এক ধর্মাবলম্বী হইতে পারে।' ভারতবর্ষ হল 'সমুদয় ভূমণ্ডলের সারভূত,' ভূদেবের অভিমত—'সেই ভূভাগেই সর্বাপেক্ষা উদারতর ধর্ম সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই দেশেই সব ধর্মের সামঞ্জস্যবিধান এবং একতা সম্পাদন হইবে।' (দ্রঃ ৭ম অধ্যায়, পুষ্পাঞ্জলি)

দুজনেরই ভরসা অতীতের ইতিহাস।*৮ কিন্তু বিশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের (১৯১৭) পর পৃথিবীর চেহারাই সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় ঘটে গেছে আমূল পরিবর্তন। অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য নিয়ে তাকে আর ভবিষ্যতের দিকে চালনা করা অসম্ভব। 'পরার্থপরতা এবং স্বার্থপরতা' এই বিপরীতার্থ বোধক শব্দদুটির কোঁত্‌পন্থী ব্যাখ্যান এবং ভূদেব-পন্থী খণ্ডন দুইই বর্তমান প্রেক্ষিতে হয়ত অযৌক্তিক বলে গণ্য হতে পারে। রাষ্ট্রশক্তি জনকল্যাণের প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ না করলে 'পরার্থপরতা' জাগেনা। তাই একালের সব রাষ্ট্রই 'প্রজাতন্ত্র,' 'জনগণতন্ত্র', 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট' ইত্যাদি নামে আত্মপরিচয় দেয়। 'অপরের প্রতি কর্তব্য' এখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 'নাগরিক দায়িত্ব'-পঙ্ক্তীর অন্তর্ভুক্ত।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গদর্শনে লিখেছিলেন 'কার্যকারণ সম্বন্ধ' (১২৮০, মাঘ), ও 'সমাজ বিজ্ঞান' (১২৮১, ফাল্গুন)। ভূদেবের সমাজচিন্তা প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধ দুটির আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রথম প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ দেখিয়েছেন--ঈশ্বরেচ্ছায় নয়, কার্যকারণ সম্বন্ধেই জগৎ চলছে। সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পূর্বসূরী হিসেবেই তিনি 'নিয়মের রাজত্ব' ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধের সারকথা এর সম্পূরক। 'বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই নিয়ম সমষ্টি বিশ্লেষিত, মানব সমাজেও নিয়মের কার্যকারণ শৃঙ্খল আছে।' নৈসর্গিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যেমন ধূমকেতু ঝড় বজ্রপাতের অলৌকিক ব্যাখ্যার গুরুত্ব কমেছে, তেমনি সমাজ বিজ্ঞানের লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজবদ্ধ মানুষের চিন্তা-কর্ম-আচরণের প্রকৃতি অনুধাবন করা, সামাজিক উন্নতির পথ দেখানো। রাজকৃষ্ণ একথাও বলেছেন, নৈসর্গিক বিজ্ঞানের মত সমাজবিজ্ঞান নিখুঁত, অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না।

এডুকেশন গেজেটে সামাজিক প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত পরিচ্ছেদগুলি ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে শুরু করে ২৪শে পৌষ, ১২৯৩ থেকে, শেষ হয় ১২৯৬ সালের মাঘ মাসে। ভূদেব অবশ্যই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত মতামতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পারিবারিক প্রবন্ধ-সামাজিক প্রবন্ধ রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র-যোগেন্দ্রচন্দ্র-রাজকৃষ্ণ প্রমুখের পরিবার, জাতি ও সমাজ বিষয়ক রচনাবলীর সংস্কার ভূদেবের মনে সক্রিয় ছিল, বলা যায়।

পারিবারিক প্রবন্ধ-সামাজিক প্রবন্ধ রচনার পূর্ববর্তী কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	পুস্তিকা	১৮৭১
একান্নবর্তী পরিবার-যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ	বঙ্গদর্শন	১৮৭২
হিন্দুজাতি-হিন্দুসমাজের বর্তমান অবস্থা-ঈশ্বরচন্দ্র বসু	পুস্তিকা	১৮৭২
হিন্দুর আচার ব্যবহার-মনোমোহন বসু	পুস্তিকা	১৮৭২
জ্ঞান ও নীতি-রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	বঙ্গদর্শন	১৮৭২
বঙ্গদেশের কৃষক-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বঙ্গদর্শন (সূচিত)	১৮৭২
হিন্দুধর্ম মর্ম-লোকনাথ বসু	পুস্তিকা	১৮৭৩
বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বঙ্গদর্শন	১৮৭৩
বহুবিবাহ - ঐ	বঙ্গদর্শন	১৮৭৩
জাতিভেদ-যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	বঙ্গদর্শন	১৮৭৩
বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত (২য় প্রস্তাব) বিদ্যাসাগর	পুস্তিকা	১৮৭৩
মিল, ডার্বিন ও হিন্দুধর্ম-বঙ্কিমচন্দ্র	বঙ্গদর্শন	১৮৭৫
ভারত মহিলা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	বঙ্গদর্শন	১৮৭৫
সমাজের পরিবর্ত কয়রূপ—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	বঙ্গদর্শন	১৮৭৮
Castes in India—Jogendra Chandra Ghosh	*C. R.*	*1880*
Our joint Family organisation do	*C. R.*	*1881*
The Political side of Brahmanism do	*C. R.*	*1881*
Change and Progress T. N. Mukerjee		*1888*
দ্বিতীয়বার বিবাহ—অজ্ঞাতনাম	বঙ্গদর্শন	১৮৮০
বাঙালী হিন্দুর পরিণয়প্রথা-অক্ষয়চন্দ্র সরকার		১৮৮২
বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা-অক্ষয়চন্দ্র	সাধারণী	১৮৮৪
বর্ণভেদ, বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত—যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-চিন্তা তরঙ্গিনী	পুস্তিকা	১৮৯০
ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা-লালমোহন বিদ্যানিধি	বঙ্গদর্শন	১৮৯০
হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা-রাজনারায়ণ বসু	পুস্তক	১৮৯০
সতীদাহ-চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	বঙ্গদর্শন	১৮৯০
সতীদাহ-নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	বঙ্গদর্শন	১৮৯১
সমাজ সংস্কার- ঐ	বঙ্গদর্শন	১৮৯১
পৌরাণিক অবতারত্ব-যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	বঙ্গদর্শন	১৮৯১

এ ছাড়া বিদ্যাসাগরের বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহ বিষয়ে তিনটি পুস্তিকা (১৮৫০, ১৮৫৫) আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত

গিরিশচন্দ্রের 'হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থা' (১৮৫৪) 'ভারতীয় নারীগণের অবস্থা (১৮৫৪) এবং 'হিন্দুর একান্নবর্তী পরিবার' (বেঙ্গলী ১৮৬৭) প্রভৃতি ইংরেজী রচনাও উল্লেখযোগ্য।

উপরি-উক্ত প্রবন্ধের বিষয়গুলি থেকেই বোঝা যায়, ১৮৫০ সালের পর বাঙালী বুদ্ধিজীবী মহলে স্বজাতি ও স্ব-সমাজ সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ জেগেছিল। কোন বিদেশী সমালোচকের মতে ইংরেজী-শিক্ষিতদের কাছে উনিশ শতকের '৫০-পরবর্তী কাল হল' ***decades of disillusionment***,৯ ইংরেজি শিক্ষায় প্রবল উৎসাহ এবং সেই শিক্ষার সম্পর্কে মোহভঙ্গ ভূদেবের ব্যক্তিজীবনের দুটি পর্যায়ের সাক্ষ্যবহ। দুটি ঘটনাই 'ভূদেব চরিত' প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে। শৈশবে ইংরেজি শিক্ষকের অধ্যাপনার গুণে ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য, য়ুরোপের ইতিহাস ও দর্শনে এমন অনুরাগ জন্মাল যে তিনি পরীক্ষায় সংস্কৃতে খুবই খারাপ ফল করেন। পিতামহের ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি সংস্কৃত কলেজে না গিয়ে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। একসময় 'ইয়ং বেঙ্গলী' মোহে তিনিও উপবীত ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। তারপর পিতা বিশ্বনাথের সঙ্গে রোজ গঙ্গাস্নান এবং যাতায়াতের পথে শাস্ত্রচর্চার ফলে সেই মোহঘোর কেটে যায়।

হিন্দু কলেজের রামচন্দ্র মিত্র পৃথিবীর গোলাকৃতি অবস্থান বোঝাবার সময় প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষ করলে তিনি ক্ষুব্ধ হন, পিতার সাহায্যে 'গোলাধ্যায়' পড়ে শিক্ষক মহাশয়ের ভ্রান্তি নিরসন করেন। কিন্তু এ শুধু ভ্রান্তি নয়, প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র বিষয়ে ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের অজ্ঞতা অবজ্ঞা এবং অহংকারেরই পরিচয়। এই অবজ্ঞার প্রতিক্রিয়া ভূদেবের মননে ও রচনাবলীতে।১০

মনে রাখতে হবে, ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের শ্রেষ্ঠ সময়েই ভূদেব হিন্দু কলেজে শিক্ষা পেয়েছিলেন। সুতরাং ঐ কলেজের সূত্রে তিনি ডিরোজিয়ানদের বিদ্রোহ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রমুখ র‍্যাডিক্যালদের চিন্তামুক্তি, বিজ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।১১ রামমোহন রায় ও অক্ষয় কুমার দত্তের মননচর্চা তাঁর যৌবনের অব্যবহিত পূর্বে যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সে বিষয়েও তিনি অবহিত ছিলেন।১২

মনু-শাসিত সনাতন ভারতীয় সমাজের বনিয়াদের ওপর পিতা বিশ্বনাথ শৈশবেই তাঁকে দৃঢ়ভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাই পশ্চিমী হাওয়ার ঝড়ে তিনি বিপর্যস্ত হন নি, তীব্র প্রতিক্রিয়া জেগেছিল। সেই প্রতিক্রিয়ার

ফল গভীর আত্মানুসন্ধান, ভারতীয় সমাজের আত্মিক পরিচয় জানার জীবনব্যাপী সাধনা--তাঁর পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ।

পারিবারিক-সামাজিক প্রবন্ধ কোন ছাত্রপাঠ্য সমাজ বিদ্যার টেক্সট্ বুক নয়, তৎকাল প্রচলিত কয়েকটি সমাজতাত্ত্বিক ধারণার ভ্রান্তি নিরসন এবং ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের প্রতি ঔদাস্যমোচন তাঁর লক্ষ্য।

সামাজিক প্রবন্ধের উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখেছেন, 'ইংরাজী শিক্ষিত এতদ্দেশীয় প্রৌঢ় এবং যুবকদিগকে মানসচক্ষে রাখিয়া সমাজতত্ত্ব বিষয়ে সুচিন্তার উদ্রেক করিবার অভিলাষে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছি।'

তাঁর মনে হয়েছিল, তখনকার 'ইংরেজী শিক্ষিত অনেকের মধ্যে কি ধর্ম সম্বন্ধে, কি পারিবারিক ব্যবস্থায়, কি আচার ব্যবহারে, সর্ব বিষয়েই তথ্যজ্ঞান অস্ফুট, কর্তব্যসূত্র এবং কার্যকলাপ অব্যবস্থিত।'

যে-কজন য়ুরোপীয় বিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিকের রচনাবলী এদেশের নব্য শিক্ষিতদের মানসিক গঠনে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাদের মধ্যে জন স্টুয়ার্ট মিল, চার্লস ডারুইন, ফ্রানসিস বেকন, জর্জ কুম্ব, অগস্ত কোঁত, হার্বার্ট স্পেন্সর, কেপলার প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সামাজিক প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বে এইসব পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের চিন্তাধারা আমাদের সনাতন সংস্কারে, চিরাচরিত ধর্ম ও সমাজ-ধারণায় প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল।১৩ তিনি সকলের বই সযত্নে পড়েছেন, আমাদের সমাজের পক্ষে যার যতখানি চিন্তার ফসল উপকারী বলে তাঁর মনে হয়েছে, যথাস্থানে তার উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সংস্কার ও ইংরেজশাসনের ইতিবাচক দিকের আলোচনায় ভূদেব কখনো কার্পণ্য করেন নি। যথেষ্ট উদারভাবে তিনি স্পেন্সার কোঁত্ মিল প্রমুখ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

পারিবারিক-সামাজিক এবং আচার প্রবন্ধ গ্রন্থত্রয়ীতে ভূদেবের যে মানসিক ভূমণ্ডল উদ্ঘাটিত হয়েছে, সেখানে যেমন আছে প্রাচীন ভারতবর্ষের সারাৎসার, তেমনি আধুনিক য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ অবদান, সেখানে ভারতের নীতি শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি য়ুরোপের কারিগরি বিদ্যা, যানবাহন পদ্ধতি ও স্বাধীনতাস্পৃহা সমান মর্যাদা পেয়েছে। তবে তিনটি গ্রন্থের সনাতনী বা রক্ষণশীল ঝোঁক একরকম নয়। এ সম্পর্কে যথাস্থানে বিশদ আলোচনা করা হবে।

সামাজিক প্রবন্ধে যেহেতু ভূদেবের পরিণততম চিন্তার পরিচয় আছে, তাই আলোচনার সুবিধার্থে সামাজিক প্রবন্ধাবলীকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হল।

ভূদেব* সম্পূর্ণ স্বদেশীয় ঐতিহ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সংঘর্ষে বিচলিত ভারতবর্ষের সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন। সেই বিশ্লেষণে যেমন তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় মেলে, তেমনি বিশ্লেষণের ভঙ্গিটিও মৌলিক। সমস্যাগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) জাতীয় ভাব কি, তার উপাদানই বা কি কি?

(২) ভারতবর্ষ মূলত হিন্দুর দেশ। কিন্তু জৈন বৌদ্ধ মুসলমান খ্রীস্টান প্রভৃতির সঙ্গে তার সামাজিক প্রকৃতির একরূপতা বা আত্মীয়তা কি সম্ভব?

(৩) ইংরেজের সঙ্গে অন্য বহিরাগত জাতির এদেশে আগমনের কি কি পার্থক্য?

(৪) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া উচিত?

(৫) য়ুরোপীয় সমাজ কি ঐহিক এবং ভারতীয় সমাজ সম্পূর্ণ অনৈহিক?

(৬) বস্তুবিদ্যা সম্পর্কে আমাদের মনোভাব কি হওয়া উচিত? বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বা বিভিন্ন বিজ্ঞানের তত্ত্ব-প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিদেশীয় ব্যক্তি ও পদ্ধতি কি অপরিহার্য?

(৭) এদেশে শিল্পের উপযোগী কাঁচা মালের উৎপাদন প্রচুর, সুতরাং ভারতে শিল্পায়ন চাই, কিন্তু বিদেশী প্রয়োগবিদ এবং বিদেশী শিল্প সামগ্রীর আমদানি কি অপরিহার্য?

(৮) সনাতন হিন্দু সমাজ, তার শাস্ত্র-পুরাণের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংঘাতে ভবিষ্যৎ ভারতীয় সমাজের চিত্র কি রকম হবে?

দুই

'পরাধীন জাতির পক্ষে কি 'জাতীয়ভাব পরিবর্ধনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র?' এ বিষয়ে কোন শ্রদ্ধাভাজন য়ুরোপীয় ব্যক্তির সঙ্গে ভূদেবের কথোপকথন হয়েছিল। তিনি ছিলেন আইরিশ জাতীয় রোমান ক্যাথলিক, ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করে তিনি কারারুদ্ধ হন। পরিণত বয়সে তাঁর ধারণা হয় যে,

*'The first systematic and original Social Scientist of modern Bengal.' Prof Benoy Kumar Sarkar, Sir Gnroodas Banerjee Centenary Conmemoration volume, P175, C. U.

'সংকীর্ণ আইরিশ জাতীয়ভাবটি সুবিস্তীর্ণ বৃটিশ জাতীয়ভাবে পর্যবসিত হওয়াই উচিত।' ভূদেব এই মনোভাব সমর্থন করেন নি। আইরিশ জাতির অবস্থা কতকাংশে ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনীয়, সম্পূর্ণত তুলনীয় নয়।

(ক) 'আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই. একেবারে ইংরাজের জিনিস হইয়া যাইতে চাহিনা।'

(খ) 'আমরা ইংলণ্ড হইতে স্বাতন্ত্রিকতা চাহি না, অন্তত বহুকালের জন্য চাহিনা।' আইরিশরা ইংরেজী শিক্ষার গুণেই ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, ভারতও ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে জাতীয়ভাবে উদ্দীপিত হয়েছে, কিন্তু বিদ্রোহ না করে আরো বেশী ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেছে, আরো বেশী সংস্কৃত পড়েছে। ভূদেবের ধারণা—'স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি অনুরাগ' প্রত্যেক জাতিরই প্রকৃতিগত। যে যে বহিরঙ্গ লক্ষণে জাতীয়ভাবের বিকাশ ঘটে তার মধ্যে তিনি চারটি লক্ষণকে প্রধান রূপে চিহ্নিত করেছেন :

(১) আকার এবং রূপ সাদৃশ্য,
(২) ধর্ম এবং আচার সাদৃশ্য,
(৩) ভাষা এবং উচ্চারণ সাদৃশ্য,
(৪) রাজ্য শাসন এবং সামাজিক প্রণালীর সাদৃশ্য।

এখানে লক্ষণীয় যে পশ্চিমের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জাতীয়তার (ন্যাশানালিটি) যে-লক্ষণগুলি প্রধান রূপে বিবেচিত হয়, তার অনেকগুলিই ভূদেবের আলোচনায় উল্লিখিত। কেবল ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যের কথা বলা হয় নি। তবে 'সমস্ত অনুষ্ঠানে এক জাতীয় লোকের মধ্যে অনেক প্রকার সাদৃশ্য' উপলব্ধির কথাও তিনি বলেছেন। এর দ্বারা সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যের কথাই বলা হয়েছে।

তাঁর জাতীয় উপাদান বিচারের ভঙ্গিটিও মৌলিক। প্রথমত ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ, সমস্ত পৃথিবীর প্রতিকৃতি স্বরূপ। কোথাও উর্বর সমতলভূমি, কোথাও অনুর্বর উষরতা ভারতীয় প্রকৃতির অঙ্গ। এজন্যই প্রদেশভেদে ভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজ উদারতা সম্পন্ন। যেহেতু ভারতীয় শাস্ত্রে পরধর্মে বিদ্বেষ নিষিদ্ধ, তাই ধর্ম বিদ্বেষের জড় দৃঢ় হতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত ভারতীয় সমাজ বহু ভাষাভাষী হলেও তার ভাষাগুলি মূলতঃ একই আর্যভাষার রূপভেদ বলে ভাষাগত ঐক্যও সুদৃঢ় হতে পেরেছে। 'কোনো একখানি নব্য মহারাষ্ট্রীয়, কি তেলুগু, কি হিন্দী, কি বাংলা, কি

ওড়িয়া পুস্তক লইয়া দেখ, সকল ভাষাই এক সংস্কৃত হইতে আপন আপন উপজীব্য শব্দ সকল গ্রহণ করিতেছে—'

'উচ্চারণ প্রণালী সকল ভারতবর্ষীয় লোকেরই যে একাধিক তাহার অপর প্রমাণের প্রয়োজন নাই। এই বলিলেই হইবে যে সংস্কৃত বর্ণমালাতে ভারতবর্ষের সকল ভাষাই লিখিত হয়।'

তৃতীয়ত 'সমস্ত ভারতবর্ষের রাজ্য শাসন এক্ষণে সর্বতোভাবে এক হইয়া উঠিয়াছে।' 'এক্ষণে আমাদের সাধারণ সুখ দুঃখ আশা ভরসা আকাঙ্ক্ষা এবং নিরাশা একসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।' অতীতেও এই প্রশাসনগত ঐক্যের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। মান্ধাতা রামচন্দ্র যযাতি যুধিষ্ঠির বিক্রমাদিত্য অশোক এমন কি আকবরের মত মুসলমান সম্রাটের আমলেও ঐক্য ছিল। ইউনিটি ইন্ ডাইভারসিটি বা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বিষয়ের দিকে সম্ভবত তিনিই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এক শাসন পদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী ফল জনগণের সমসুখদুঃখতা বা সহানুভূতি।

তিন

ভারতবর্ষে মুসলমান খ্রীস্টান জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরাই বা কতটা জাতীয়ভাবের পক্ষপাতী? বৌদ্ধ ও জৈনরা বহুকাল পাশাপাশি হিন্দু সমাজে বাস করে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজেরই অন্তর্গত হয়ে পড়েছেন। খ্রীস্টান ও মুসলমানরা হয়তো ততটা হতে পারেননি, তবু অন্য দেশের মুসলমানদের তুলনায় এদেশের মুসলমানরা অনেক বেশী ভারতীয়তাপন্ন. খ্রীস্টানরাও ব্যতিক্রম নন।

ভারতের মুসলমানেরা সকলেই হয় তুরস্কসম্রাট নয়তো পারস্যসম্রাটকে নিজেদের ধর্মশাস্তা বলে মনে করেন, কিন্তু তাতে জাতীয়ভাবের ব্যাঘাত হয়না। যেমন ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যাণ্টভেদে ইংল্যাণ্ডের জাতীয়ভাব ব্যাহত হয়নি, তেমনি তাঁর ধারণা এখানকারও হিন্দু এবং মুসলমান ক্রমে ক্রমে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত হয়ে উঠবে।

ভারতের 'বারো আনা মুসলমান' ধর্মান্তরিত, বাকি চার আনাও 'একেবারে দেশীয় সংস্রবশূন্য' নয়। ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা বা হিন্দু মুসলীম বিরোধ যে আসলে ইংরেজরই ভেদনীতির ফল, সে বিষয়ে ভূদেব অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁর দুটি মন্তব্য এখানে উদ্ধারযোগ্য।

১। 'হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদরক্ষা করিবার এবং তাহা বর্ধিত

করিবার অপর একটি প্রবলতর কারণ উপস্থিত হইয়াছে।' অনেক ইংরেজ গ্রন্থকার লিখেছেন, মুসলমান আমলে হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছিল। তাতে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু যুব সমাজ মুসলমান সম্পর্কে বিদ্বেষ নিয়ে বড় হচ্ছে।১৬ তুলনায় 'পূর্বকালের পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত, সদাচার সম্পন্ন সদ্ ব্রাহ্মণদিগেরও মনে তাহার অর্ধাংশ দেখা যাইত না।' ভূদেব নিরপেক্ষ মন নিয়ে যথার্থ ঐতিহাসিক পটভূমিতে রেখে সমস্যাটিকে বিচার করেছেন। উদার মানসিকতা ছিল বলেই তিনি হিন্দু-মুসলমান সমাজের মধ্যে ঐকমত্য দেখেছেন। তাই 'উও ইয়ে হায়' তাঁর কাছে 'সর্বংখল্বিদং ব্রহ্ম' শ্লোকের প্রতিরূপ মনে হয়েছে।

ভূদেব আজীবন সরকারী কর্মী ছিলেন, তাঁর দুই ছেলেও সরকারী কর্মে নিযুক্ত হন। তাই তাঁর পক্ষে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু বলা কঠিন ছিল। সেই কঠিন কাজ উনিশ শতকের লেখকেরা রূপকের আড়ালে দাঁড়িয়ে সম্পন্ন করেছেন। 'বঙ্কিমের উক্তি এত বাঁকা কেন' এই প্রশ্নের জবাবে বঙ্কিম নাকি বলেছিলেন. 'জুতোর চোটে'। অর্থাৎ ইংরেজের আইনের ভয়ে।

ভূদেবও সুকৌশলে ইংরেজ প্রশাসনের ভেদাত্মক বুদ্ধির উল্লেখ করেছেন। মহারানী ভিক্টোরিয়া এবং পার্লামেণ্টকে আদর্শরূপে ধরে নিয়েই তিনি এই ভেদবুদ্ধির নিন্দা করেছেন।

১। 'ভারত ইংরেজ রাজপুরুষদের নীতি' 'কৌশল করিয়া কখনো মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর একটু অধিক আদর করেন এবং যখন হিন্দু সেই আদরে ভুলিয়া যায়, তখন আবার মুসলমানের দিকে বিলক্ষণ ঝোঁক দেন।'

পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনে কংগ্রেস-লীগের উত্থানপতন কি এইসূত্রে আলোচিত হতে পারে না? হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি সাক্ষ্য দেয় যে আমরা ইংরেজের ভেদ-শাসন নীতির শিকার হয়েছি।

এমনকি রবীন্দ্রনাথ যে ভারতে ইংরেজ-চরিত্রের দ্বৈধস্বরূপের কথা বলেছেন 'ছোট ইংরাজ' ও 'বড়ো ইংরাজ' বিশেষণে, ভূদেব সে বিষয়েও সচেতন ছিলেন। দুটি উদ্ধৃতি দিলেই বোঝা যাবে।

১। 'হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া রাখিবার জন্য কোন কোন ইংরাজ আর একটি উপায় অবলম্বন করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ঐরূপ কোন অভিসন্ধি আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না।'

'মহারাজ্ঞীর নীতিবিশারদ মন্ত্রীবর্গ এবং 'পার্লিয়ামেণ্ট' এখানে বড়ো

ইংরেজ রূপে গণ্য। সরকারী চাকুরে ভূদেবের কিছু আইনানুগ কৌশলও এর মধ্যে থাকা অসম্ভব নয়। ইংরেজ প্রশাসনের ভেদনীতির নিন্দা করেই পরক্ষণে মহারানীর আদর্শের প্রশংসা বিদেশী শাসনের আওতায় গা-বাঁচানোর চেষ্টা মাত্র। কারণ এদেশের ইংরেজ শাসকরা তো মহারানীর পার্লামেন্টেরই অনুমোদিত। বলা যায়, তাঁরা তো সবাই প্রেরিত রাজপুরুষ। ব্রিটিশ 'সেন্স অব্ জাস্টিস'১৭ ভূদেবের মনে বড়ো ইংরেজের স্বপ্ন জাগিয়ে রেখেছিল। অথচ তিনি জানতেন, রোমীয় আইনের সূত্রেই ইংরেজ পেয়েছে ভেদনীতি।

১। 'ঐ সকল ইংরাজের এই কৌশলটি (ভেদনীতি) যে অপরিণামদর্শিতার ফল তাহা নিঃসন্দেহ, কারণ যদিও রোমীয়দিগের ঐরূপ রাজনীতি থাকা সত্য হয়, তথাপি সে রাজনীতির বলে রোম সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হয় নাই।'

প্রসঙ্গত ইংরেজ জাতি সম্পর্কে ভূদেবের ধারণা লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। সেকালের সনাতনপন্থীদের মত য়ুরোপকে অস্বীকার করে সনাতন ভারতীয় শাস্ত্র ও লোকাচারকেই তিনি সর্বস্ব মনে করেন নি।১৮

ভূদেবের চোখ ও মন পূর্ব ও পশ্চিমের দিকে সমান খোলা ছিল বলেই কোন গোঁড়ামি তাঁর স্বচ্ছবুদ্ধিকে কখনও আচ্ছন্ন করেনি। এদেশের ইংরেজ শাসনের ভূমিকা সম্পর্কে ভূদেবের ধারণা—এদেশে ইংরেজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই য়ুরোপীয় ও ভারতীয়দের মনে একটি তুলনার ভাব জেগেছে। সেই মনোভাবেরই একটি দিক উগ্র পাশ্চাত্ত্যানুকরণ। অনেকের ধারণা স্বদেশচেতনা বা জাতীয়তাবোধ কখনও ভারতে ছিল না, এও ইংরেজের আনা য়ুরোপীয় ফল। ইংরেজী শিক্ষা ওপর থেকে আরোপিত, সুতরাং অন্তঃসারশূন্য। ইংরেজ নিজের দেশে একরকম, উপনিবেশে অন্যরকম।১৯ প্রমাণ কবডেনের বৈদেশিক শস্য আমদানি-বিষয়ক আন্দোলন। জমিদারদের স্বার্থে আইনত বিদেশ থেকে শস্য আমদানি বন্ধ ছিল, প্রবল খাদ্যাভাব এবং দুর্ভিক্ষের ফলে সে আইন উঠে যায়। এসব হল 'ইংরাজে ইংরাজে কথা, এখানে 'লাভের ভাগীও ইংরাজ আর লোকসানের ভাগীও ইংরাজ।'

হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যকে ইংরেজরা যথার্থ ভয় করত, তাই এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে বিরোধ বাড়ে সরকারি কর্মনিয়োগে সেদিকে নজর দেওয়া হয়; কিন্তু দুয়ের মধ্যে তুলনায় মুসলমান সমাজকেই ইংরেজ বেশী অবিশ্বাস করে। সিপাহী বিদ্রোহের সূচক হিন্দু সিপাহীরা কিন্তু বিদ্রোহ সফল হলে সিংহাসনে মুসলমান বাদশাহকেই বসাতেন।

ইংরেজের বিদ্যালয়, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারণা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-শিল্প ও কারিগরী বিদ্যা অবশ্যই গ্রহণ করব। কিন্তু তার জন্য ইংরেজের রীতিনীতি আদব কায়দার অনুকরণ করা ভুল। জাপানের মত আমরা আধুনিক কারিগরী বিদ্যা নেব, সুশিক্ষিত হয়ে আমরাই কলকারখানা স্থাপন করব। ইংরেজের কারখানায় তৈরী বিদেশী পণ্যের ক্রেতামাত্র হয়ে থাকব না।[১০]

চার

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তিনভাবে আমাদের ঐশ্বর্য কেড়ে নিচ্ছে, তাই ভারতের দারিদ্র্য ক্রমবর্ধমান।

(ক) সস্তায় কাঁচামাল কিনে সে য়ুরোপে চালান দিচ্ছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের মুনাফা ভারতীয় বণিকদের মাধ্যমে ভারতের জনগণের হাতে পৌঁচচ্ছে না। মুনাফা ইংরেজের।

(খ) এদেশের নিজস্ব কৃষি-অর্থনীতি ইংরেজ প্রশাসনে নষ্ট হয়েছে। বিদেশী পণ্যের মোহে স্বদেশী পণ্যের বাজারে মন্দা দেখা দিয়েছে। যে-বৈজ্ঞানিকতা ইংরেজ এবং অন্য পাশ্চাত্ত্যজাতির উন্নতির মূল, সেই বৈজ্ঞানিকতা ইংরেজ প্রশাসন ভারতে প্রবর্তন করেনি। ইংরেজী শিক্ষায় ভারতীয়েরা বিজ্ঞানের কেতাবী তত্ত্ব আয়ত্ত করেছিলেন মাত্র। মাতৃভাষায়-বিজ্ঞান চর্চা হয়নি; সুতরাং দেশের সাধারণ মানুষ সে বৈজ্ঞানিকতার ফল পায়নি। কৃষি প্রধান দেশে কৃষিক্ষেত্রেই সর্বাগ্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। বরং প্রচলিত পদ্ধতি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অবনমিত হয়েছে।

(গ) ভারতের শিল্পায়নে ইংরেজের ভূমিকা ভোক্তার, শিক্ষকের নয়। শিল্পায়নের নামে আমরা বিলাতী পণ্যদ্রব্যের বাজার তৈরি করেছি। 'দেশে বৈজ্ঞানিকতার সত্য প্রবেশ হইলে, এতদিনে কলকারখানার সংখ্যা এত ন্যূন এবং যে কয়েকটি আছে তন্মধ্যে দেশীয়ের সংখ্যা এত কম থাকিত না।'

এখানেও ইংরেজের স্বদেশ এবং উপনিবেশের পার্থক্যটি ভূদেব সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিষয়ে একটি সরস গল্প বলেছেন। একজন একটি পায়রা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। একজন জিজ্ঞেস করল, পায়রা নিয়ে কি করবি। সে বলল, পুষবো। তখন সেই লোকটি বলল, আহা কৃষ্ণের জীব হত্যা করবি কেন, আমাকে দে, আমি পুড়িয়ে খাব।

তারপর তিনি মন্তব্য করেছেন, 'ইংরাজের মনের ভাবটি যেন অবিকল

এইরূপ। তিনি পোড়াইয়া খাইলেও হত্যা হয়না, অন্তে পুষিবার চেষ্টা করিলেও হত্যা করিতেছিল বলেন।'

'ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জনগণের কল্যাণে ১৮৩২ সালে ইংরেজ সরকার দু কোটি টাকা খরচ করেন। সে-কথা গৌরবের সঙ্গে বহু ইংরেজ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। ভূদেব দেখিয়েছেন, একহাত দিয়ে দান এবং অন্যহাত দিয়ে ইংরেজ গ্রহণ করেছে। আর একটি কারণ, আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ। 'ইংরাজ আমেরিকায় অপদস্থ হইয়া অবধি' উপনিবেশের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখেছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জন্য ব্যয়িত অর্থ পেয়েছিলেন স্বজাতীয় চিনিকর গোষ্ঠী।

এদেশে ইংরেজ শাসনের সুফল সম্পর্কেও ভূদেব অবহিত ছিলেন।

য়ুরোপীয় জাতির মধ্যে ইংলণ্ডে সর্বশেষে সভ্যতার বিস্তার ঘটেছে। সুতরাং 'য়ুরোপের চিত্তপ্রতীক' রূপেই এদেশে ইংরেজের আগমন। ভারতবর্ষের সীমা তখন ১৭ লক্ষ বর্গমাইল, জনসংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি এবং গ্রেট ব্রিটেনের সীমা ছিল ৮৮ হাজার বর্গমাইল, লোক সংখ্যা কম বেশী ৩ কোটি।

'এমন ক্ষুদ্র দেশের এত অল্প সংখ্যক লোক এত দূরে এমন অতি বিস্তৃত সাম্রাজ্য আর কখনো অধিকার করিতে পারে নাই'।'

তাহলে কি করে এই ঘটনা সত্য হয়ে উঠল? তার উত্তরে ভূদেবের ধারণা—"ইংরেজ সাম্রাজ্য বাণিজ্যসূচক এবং বহুচক্র অর্থাৎ অসংলগ্ন রূপেই অবস্থিত।'

এক, 'ভারতবর্ষ ইংরাজের অধীনে একচ্ছত্র হইয়া উঠিয়াছে'। রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির, যযাতি অশোক প্রমুখের শাসনকালে একচ্ছত্রতা যেমন জাতিকে সম্মিলিত করতে পেরেছিল, ইংরেজ আমলেও তেমনি সেই সম্মিলন প্রবণতা সার্থক হতে পেরেছে।

দুই, 'ইংরাজের আধিপত্যে ভারতবর্ষের মধ্যে শান্তির পূর্ণতা জন্মিয়াছে।' 'প্রাচীন হিন্দু সমাজ যেমন স্বভাবত শান্তিপ্রিয়,' ইংরেজ শাসনে সেই শান্তি সুনিশ্চিত হয়েছে। আর কোথাও দেশীয় রাজাদের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ হয় না।

তিন, এটি দ্বিতীয় সুফলেরই অনুবৃত্তি। 'ইংরাজের অধিকারে দেশে শান্তি সংস্থাপিত এবং বর্ত্মাদির বাহুল্য ও অন্তর্বাণিজ্যের বৃদ্ধি হওয়ায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশীয় জনগণের মধ্যে পরস্পর আলাপ পরিচয় ও সম্মিলন জন্মিতেছে।' প্রাচীনকালের মেলা ও তীর্থস্থানগুলি যে প্রয়োজন সিদ্ধ করতো, ইংরেজের অন্তর্বাণিজ্য এবং শান্তি শৃংখলা তা সম্ভব করেছে।

চার, অন্য 'বিজিগীষু জাতির আক্রমণ নিবারিত' হয়েছে। এখানে ইংরেজের সৈন্যবাহিনী, ইংরেজের রণতরী সর্বত্র প্রহরীর মত উপস্থিত। কোন দিক থেকে আক্রমণের আশংকা নেই।

পাঁচ, পর্তুগীজ বা ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের একটি পার্থক্য এই যে অন্য য়ুরোপীয় প্রশাসকরা আমাদের দেশাচার ও ধর্মকে সম্মান দেখান নি, 'কোম্পানীর আমলের শেষ পর্যন্ত দেশীয়দিগের আচারের প্রতিও ইংরাজের কোন অযথাচরণ হয় নাই।' খ্রীস্টান পাদ্রীদের সেজন্য কোম্পানি কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখেননি।২২ যেহেতু রাজপুতানার আবু পর্বত অহিংস জৈনদের তীর্থস্থান, তাই গো-মাংসাশী গোরা পল্টনের ছাউনি কোম্পানী সরকার প্রত্যাহার করে নেন। তার বদলে হিন্দু পল্টন রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। এমন কি ব্যবহার শাস্ত্রের ব্যাপারেও হিন্দু মুসলমানের পৃথক পৃথক নিয়ম তাঁরা মেনে চলেছেন।

ভূদেব মনে করেন, 'ইংরাজ ভারতে যে কাজ করিয়াছেন তাহা ইংরাজ ভিন্ন অপর কেহ করিতে পারেন নাই, এবং করিতে পারিতেন না---এইজন্য ইংরাজ ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার, শ্রদ্ধার এবং ভক্তির ভাজন হইয়াছেন।'২৩

পাঁচ

ভূদেব যেমন এদেশে ইংরেজ শাসনের শুভ ফলগুলি আলোচনা করেছেন, তেমনি তাঁর নির্মোহ দৃষ্টিতে কুফলগুলিও ধরা পড়েছে। তাঁর মতে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃতি মূলত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী। তাঁর নির্দেশিত পাশ্চাত্যভাবের সাতটি লক্ষণের মধ্যে তিনটি হল—স্বার্থপরতা, ঐহিকতা এবং স্বাতন্ত্রিকতা : ভারতীয় সমাজের প্রকৃতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, পরিবার, সমাজ এবং প্রাক্তন দ্বারাই ব্যক্তির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত। যদিও ভূদেব স্পষ্ট বলেছেন, 'আমরা ইংলণ্ড হইতে স্বাতন্ত্রিকতা চাহি না, অন্তত বহুকালের জন্য তাহা চাহি না।' আরও বলা যায়---'ভারতবর্ষের একতা-সাধন ইংরাজের অধীনতাতেই সম্ভব, অতএব ইংরাজের প্রতি সম্যক বন্ধুবুদ্ধি এবং রাজভক্তি করিতে হইবে।'

তবু ইংরেজ শাসনে প্রবল আস্থা সত্ত্বেও কয়েকটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কুফল সম্পর্কে তিনি পূর্বাহ্ণেই অবহিত ছিলেন।

(১) আধুনিক ঐতিহাসিক বিজ্ঞান বলে, জাতির কর্মশক্তি জলবায়ু-নির্ভর, গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোকেরা অলস এবং উর্বরা জমির দেশ, শস্যসমৃদ্ধ ও প্রজা বহুল হয়। ভূদেব দেখিয়েছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত আসলে অনুপপত্তিসূচক (*full*

of fallacious Conclusions) তিনি সহজেই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। আরব ও চীনের দক্ষিণাংশ গ্রীষ্মপ্রধান। ঐ অঞ্চলের লোকেরা যথেষ্ট কষ্টসহিষ্ণু।

(২) য়ুরোপের 'পর্যটক' মাত্রেই বলেছেন, ভারতের মাটি উর্বরা এবং ভারতের কৃষক পরিশ্রমী।

(৩) অধিকাংশ ভারতবাসী নিরামিষাশী বলেই দুর্বল এবং সাহসহীন। য়ুরোপীয়দের এই ধারণাও ভ্রান্ত। পাঞ্জাবী, জাঠ, ভোজপুরীয়া এবং গ্রীক স্পার্টাকানরা নিরামিষাশী, কিন্তু দুর্বল বা ভীরু নয়। সুতরাং ইংরেজেরা ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেনি নি।২৪

(৪) ইংরেজ শাসনের অন্যতম কুফল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদবুদ্ধি। মুসলমান আমলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য সত্ত্বেও পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ছিল। 'ভারতবাসী মুসলমানেরা অনেকানেক বিষয়ে হিন্দুদিগের আচার গ্রহণ করিয়াছিল। এমন প্রদেশ নাই যেখানকার অধিকাংশ মুসলমান, জ্যোতির্বিদ এবং অপরাপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কিছু সম্মান এবং আদর না করেন সেখানে গো বধ করিতে এবং গো-মাংস ভক্ষণ করিতে কিছু সংকুচিত না হন---যেখানে হিন্দু-দিগের পর্বোৎসবে আমোদ প্রমোদ না করেন।' ইংরেজ লেখকেরা 'হিন্দুদিগের মনোমধ্যে মুসলমানদিগের প্রতি একটি গূঢ় বিদ্বেষ বীজ' বপন করেছেন। অথচ লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, ছাপরার কয়েকজন ব্রাহ্মণ এক মৌলবী সম্বন্ধে কি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন। 'মৌলবী সাহেব মুসলমান হইলে কি হয়, উনি এমন পবিত্রাচার ও পবিত্রমনা ব্যক্তি যে, আমরা ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি উঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করি, তাহাতে আমরা অপবিত্র হইলাম এমন মনে করিতে পারিনা।' মৌলবীদের মুখে 'উও ইয়ে হ্যায়' উক্তির মধ্যে ভূদেব 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বেদ বাক্যের প্রতিধ্বনি শুনেছেন। ইংরেজ সরকার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কলহ বৃদ্ধি করেছেন। লেখকের মতে রোমীয় ইতিহাস থেকেই ইংরেজ এই ভেদ-ভিত্তিক রাজ্যশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।২৫ শত্রুরাজ্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধ বাধিয়ে সবগুলিকে রোমীয় রাজশক্তি জয় করেছিল। এখানেও কখনো মুসলমান পক্ষে, কখনো হিন্দু পক্ষে বিশেষ পক্ষপাত দেখিয়ে অপর পক্ষকে বিদ্বিষ্ট করে তুলেছে।

(৫) উন্নতিশীলতা বা ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন বিষয়ে পাশ্চাত্য ধারণা ইংরেজ শাসনকালেই আমাদের চিন্তা-চেতনায় সঞ্চারিত হয়। মানুষ প্রাণীজগতের

মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আবার নানা ধাপে অগ্রসর মানবসমাজ পশ্চাৎপদকে ফেলে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। এইভাবেই চলেছে অহোরাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচন।

ভূদেবের মতে উক্ত ধারণাটি নিতান্ত 'অমূলক', 'ক্রমোৎকর্ষের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায় না।'

(৬) তিনি প্রাচীন ও আধুনিক কালের সৈন্যদের শক্তিমত্তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। প্রাচীনকালের সৈন্যরা অতি গুরু বর্ম ও অস্ত্র ব্যবহার করত, প্রয়োজনে প্রত্যহ বিশ-পঁচিশ ক্রোশ হাঁটতে পারত। একালেও সৈন্যরা তার বেশি পারে না।

একজন ইংরেজ ঐতিহাসিকের উক্তি উদ্ধৃত করে লেখক দেখিয়েছেন, প্লেটো এরিষ্টটল্ আর্কেমেডিস্ এবং আন্টনাইনসের সমান মনীষী একালে আবির্ভূত হন নি।

(৭) ইংরেজ শাসনে আমাদের আধুনিক শিক্ষা হয়েছে ঐকদেশিক এবং শ্রমবিভাগের দ্বারা বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠা হলেও শ্রমিক শোষণই বৃদ্ধি পেয়েছে। ইংরেজ য়ুরোপের 'চিত্তপ্রতীক' রূপে ইহসুখবাদ প্রচলন করেছেন। চার্বাক মতে বা লোকায়ত দর্শনে হেডনিজম্ ছিল, কিন্তু ভারতে বেদান্ত বা অন্য আস্তিক দর্শনের ভাবধারাই মুখ্য। ইংরেজরা আবার নতুনভাবে ঐহিকতা এবং সুখবাদের জীবনাদর্শকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। এতে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক শক্তি অবহেলিত হচ্ছে। ইংরেজের বস্তুবাদী জীবনচর্যায় স্বাতন্ত্রিকতা বিশেষ মূল্য পায়। কিন্তু প্রাচীন ভারতের আদর্শ ছিল সামাজিকতা, স্বাতন্ত্রিকতা নয়। নিজের দেশে ইংরেজ শাসন যে স্বাতন্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠা করেছে, এদেশে তার প্রসারে ইংরেজ সরকার অনিচ্ছুক। ভূদেব যথার্থ মন্তব্য করেছেন, 'এখন এদেশের বিধি ব্যবস্থা ইংরাজ রাজেরই ইচ্ছানুযায়ী হইয়া থাকে। তাহাতে দেশীয় জনগণের মধ্যে প্রকৃত স্বাতন্ত্রিকতা জন্মিতে পারে না।'২৭

(৮) বিজ্ঞানের বহুমুখী শক্তি যেমন পরোক্ষত এদেশে ইংরেজ শাসন ও ইংরেজী শিক্ষারই ফলশ্রুতি তেমনি বাহ্যবিষয়ে আগ্রহ, বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি-কার্যে বিজ্ঞানের দ্বারা দরিদ্র শোষণই বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানের ব্যবহারে সাধারণের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বাড়েনি, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রচলিত না হওয়ায় বিজ্ঞান তত্ত্ব সাধারণ্যে সঞ্চারিত হতে পারেনি। আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিতরাই থিওসফিচর্চা শুরু করেছেন। লেখকের ভাষায়, 'ইহারা দেশী হাত-চালা ছাড়িয়া বিলাতী হাতচালা ধরিয়াছেন, ইহারা দেশী ভূত ছাড়িয়া বিলাতী ভূত লইয়াছেন, ইহারা দেশী অবতার ত্যাগ করিয়া বিলাতী অবতার

গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন,—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের এবং কৃতবিদ্য মৌলবীদিগের মধ্যে প্রায় কেহই যোগ দেন নাই।'

ছয়

পরিবার হল সমাজের ইউনিট বা একক। ইতিহাসের বিবর্তন ধারায় পরিবারের গঠন বদলেছে। আধুনিক কালের পরিবারসংজ্ঞা স্বামী-স্ত্রী এবং পুত্রকন্যাকে নিয়ে, বৃদ্ধ পিতা-মাতার স্থানও সংকুচিত, ভাইবোনের ভরণ পোষণের দায়-দায়িত্ব অবান্তর। কিন্তু প্রাচীন সমাজে যৌথ সম্পত্তি ও যৌথ পরিবার ছিল একসূত্রে বাঁধা, তখন ছোটদের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ছিল বড়দের অপরিহার্য কৃত্য।

প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ভারতেই সবচেয়ে বেশি দিন টিঁকে আছে। যে দেশের মহাকাব্যের নায়ক সমাজের মুখ চেয়ে নিষ্কলুষ স্ত্রীকে বর্জন করে নর-শ্রেষ্ঠরূপে বন্দিত হয়েছেন এবং পরবর্তী হাজার হাজার বছরের কাব্য নাটকে তাঁরই প্রশস্তি, সেই দেশের ট্র্যাডিশন য়ুরোপের থেকে ভিন্ন।*

রাজা মেনেলাউসের পক্ষে ইথাকার অধিপতি ইউলিসিসের যোগদান এবং সর্বস্ব খুইয়ে ফিরে আসার কাহিনী প্রাচীন গ্রীক সমাজের বৈশিষ্ট্যকেই দ্যোতিত করে। কিন্তু সেই গ্রীক সমাজ স্থায়ী হয় নি, রোমক সমাজও না, গ্রীক রোমীয় সভ্যতার বিবর্তনে যে আধুনিক ইংলণ্ড ফ্রান্স আয়ার্ল্যাণ্ড প্রভৃতির জন্ম, সেখানে শিল্প বিপ্লব, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, ব্যক্তিস্বাধীনতা-বোধ ইত্যাদির ফলে পরিবার-চিন্তা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ইলিয়ড ওডিসি য়ুরোপীয় জাতির কাছে দুটি অমর মহাকাব্য মাত্র। কিন্তু ভারতীয় সমাজে রামায়ণ মহাভারতের মর্যাদা নিছক মহাকাব্য রূপে নয়, আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে মাতা-পিতার সম্পর্ক, মাতা-বিমাতার সম্পর্ক, ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের স্থান ও কর্তব্য এই দুটি কাব্য নির্দেশ করছে। তাই এ দুটি মহাকাব্য হয়েও পুরাণ এবং এই পৌরাণিক সমাজের আদর্শই বারংবার আদৃত হয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংস্রবে স্বভাবতই ইংরেজী শিক্ষিত নব্য যুবকেরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তথা নারী-ব্যক্তিত্বের অধিকার চাইলেন। উনিশ শতকের

*লক্ষণীয় যে, ভারতীয় সমাজের আদর্শ প্রতীক রূপে ভূদেবের রচনায় নানা প্রসঙ্গে রাম-সীতার কথা উল্লিখিত হয়েছে। 'স্বদেশী সমাজ'-পর্বের রবীন্দ্রনাথও আদর্শ প্রতীক রূপে রামের কথা বলেছেন।

সমাজসংস্কার আন্দোলনে সেই চিরাচরিত সমাজের ধারণা পরিবর্তনের ইঙ্গিত আছে। পুরনো পরিবার-কাঠামো ভাঙাটাই সমাজপ্রগতির লক্ষণ রূপে বিবেচিত হল। ভূদেব একালের সেই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত নব্য সমাজের কাছে সনাতন ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তিগুলি উপস্থিত করেছেন। *

উপস্থাপনা পদ্ধতি ভূদেবের নিজস্ব। এক্ষেত্রে কোনো য়ুরোপীয় সমাজ-বিজ্ঞানীর অনুসৃত পন্থা গ্রহণের সুযোগও নেই। কারণ পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানীরা তাঁদের সমাজব্যবস্থার জয়গানে এবং ভারতীয় সমাজব্যবস্থার দোষ দর্শনেই অভ্যস্ত। ভূদেব জানতেন, মনুবিহিত বিধানগুলি হুবহু প্রচার করলে মোটেই নব্য সমাজের কাছে গ্রহণীয় হবে না। তাই পরিবারজীবনের সমস্যাগুলিকে ভূদেব ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন।

তিনি শাস্ত্র বচন কণ্টকিত প্রবন্ধ লেখেন নি, অত্যন্ত প্রয়োজনে ব্যবহারিক জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার অনুপূরক হিসেবেই দু-একটি উদ্ধৃতি আছে। কোথাও সরস গল্পের মতো সমস্যার সূচনা। কোথাও কথোপকথনের নাট্য সংলাপ বিষয়কে সরস করেছে।

বাল্যবিবাহ, উদ্বাহ সংস্কার, পিতা-মাতা-পুত্র-কন্যা, ভাই-ভগিনী, নিরপত্যতা, দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ, বহু বিবাহ, বৈধব্য ব্রত, চিরকৌমার প্রভৃতি ৪৮টি পরিচ্ছেদে একান্তভাবেই ঘরোয়া সমস্যাগুলির পর্যালোচনা। সাধারণত পরিবার-জীবনে ঘটনাগুলির ভবিষ্যত প্রতিক্রিয়া এবং তাদের দূর প্রসারী ফল সম্বন্ধে চিন্তা করা হয় না। বহু বিবাহ, চিরকৌমার্য, বৈধব্য সবই পাশাপাশি নৈসর্গিক বিধানের মত চলে আসছে। ভূদেব একালের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সমস্যাগুলিকে নতুনভাবে যাচাই করে দেখেছেন।

যেমন 'বাল্য বিবাহ।' য়ুরোপ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ভূদেবের মতে বাল্য বিবাহে অধিকাংশ দাম্পত্য জীবন সুখের হয়। 'যে দেশে বয়োধিক হইলে বিবাহ হয় সেই দেশেই বিবাহ বন্ধন শিথিল এবং দম্পতি প্রণয় অন্ধ অনুরাগ বলিয়া অচিরস্থায়ী।'*

তিনি আরো বলেছেন, 'ছেলেবেলার ভালবাসাই ভালবাসা। মা বাপের

*'বাল্যবিবাহ' প্রবেশিকা পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ গেলে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় খুবই ক্ষুব্ধ হন। শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, 'প্রাতঃস্মরণীয় গুরুদাস'
—নরেন্দ্রনাথ শেঠ। পৃঃ ২১৭.

প্রতি, ভাই ভগিনীর প্রতি, খেলুড়িদিগের প্রতি মনটা যেমন কোমল ভাবাপন্ন থাকে, বয়স হইলে যাহাদিগের সহিত পরিচয় হয়, তাহাদিগের কাহারো মন তেমন হয় না।' ইংরেজিতে *calf-love* (কাফ্ লাভ) অগভীর বাল্য প্রীতি-মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন, 'বুঝি বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত আছে।' ভূদেবের মতে বাল্য বিবাহই 'প্রণয় পীযূষ আস্বাদনের' একমাত্র উপায়।

ভূদেবকে যতই রক্ষণশীল বলা যাক, তাঁর এ যুক্তি অস্বীকার করা যায় না যে. যে-সব দেশে বয়স্কপরিণয় এবং স্বেচ্ছাবিবাহ আছে, সেইসব দেশেই বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা বেশি। স্পেন ইতালি গ্রীস প্রভৃতি দেশে বাল্যবিবাহ ছিল বলেই দাম্পত্য প্রণয় অধিক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধও প্রথমটির সম্পূরক। 'দাম্পত্য প্রণয় এবং উদ্বাহ সংস্কার' প্রবন্ধটিতে একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে নবদম্পতির স্থান ও পরার্থে আত্মবিলোপের কথা আছে। আপনি খাইব, সুখ হইবে আর একজনের, আপনি পরিব, তুষ্ট হইবে আর একজন, আপনি ধন সঞ্চয় করিব, আর একজনের ভাবী হিতসাধন হইবে, এই ভাবটি বিবাহ প্রণালী হইতে অতি সহজে এবং সাধারণত জন্মিয়া থাকে।'

বলা বাহুল্য, যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 'পরিবার' সম্পর্কিত ধারণাও আমূল বদলেছে। 'অহং-বিন্দু' সেকালে ছিল একান্ন পরিবার, একালে স্ত্রী পুত্র কন্যা এবং পিতা মাতা মাত্র। ইদানীং পাশ্চাত্য অর্থেই পরিবার ফ্যামিলি) শব্দটি গৃহীত।

স্ত্রী শিক্ষা, সতীর ধর্ম, সৌভাগ্য গর্ব, দম্পতি কলহ, লজ্জাশীলতা গৃহিণীপনা---এই ছটি প্রবন্ধের বিষয় অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষা। এখানে শিক্ষার অর্থ সাংসারিক পারিবারিক কর্তব্যশিক্ষা, কলেজীয় উচ্চশিক্ষা নয়। পরিবারের গুরুজন ও অনুজের সঙ্গে ব্যবহার ও মতবিরোধে সতী-স্ত্রীর কর্তব্য, দাম্পত্য কলহে স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, রামজয় তর্কভূষণের পৌত্র, বিশ্বনাথ ন্যায়রত্নের পুত্র হিন্দু কলেজে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর সহাধ্যায়ী ছিলেন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে যাঁরা কৃতবিদ্য, সমাজ সংস্কারে যাঁরা র‍্যাডিক্যাল, তাঁরাও আচার আচরণে পশ্চিমের অন্ধ অনুকারী। দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যপ্রীতি ছিল ভূদেবের মজ্জাগত, তাই অন্য ব্যাপারে যাঁরা অগ্রণী তাঁদের অনুচিকীর্ষায় তিনি ব্যথিত হয়েছেন। তিনি আবার পুরোনো সামাজিক পারিবারিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী।

সাত

বাল্য বিবাহ এবং দাম্পত্য প্রণয়—এই দুটি সম্পূরক প্রবন্ধ থেকে লেখকের কয়েকটি সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

(১) আমাদিগের মধ্যে যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত হইয়া আছে, তাহাতেই দাম্পত্য প্রণয় সঞ্চারিত এবং সংবর্ধিত করিবার উপায় আমাদিগের নিজের হাতে আছে। আমাদিগের দেশে দাম্পত্য প্রণয়টি দুষ্প্রাপ্য বনফল নয়। ইহা বাল্যবিবাহ ক্ষেত্রে যথোচিত কর্ষণ এবং সেঁচনের ফল।

(২) স্ত্রী ইহাই শিখিবেন যে মা বাপ ভগিনী ইহাদিগের সম্পদ বা অসম্পদ তাহাকে স্পর্শ করে না। স্বামীর সম্পদেই তাঁহার সম্পদ, স্বামীর অসম্পদেই তাহার অসম্পদ। অতএব বাপের বাড়ি কিছুই নয়—শ্বশুর বাড়িই বাড়ি।

(৩) স্বামী বেঁচে আছেন, ভাল আছেন, সুখে আছেন এটি জানিলে স্বামী বেঁচে থাকিবেন, ভাল থাকিবেন, সুখে থাকিবেন, মনকে এই প্রবোধ দিতে পারিলে সতীর প্রফুল্লতা জন্মে। সতী ধর্মের মূল স্বামীর অনিষ্টাশংকা, উহার কাণ্ড নিরন্তর স্বামী দর্শনলালসা। এই কল্পতরুরূপ সতীধর্মের শাখা প্রশাখা অসংখ্য।

(৪) যে পতিপরায়ণার সৌভাগ্য গর্ব নাই, তাঁহার তপস্যা সিদ্ধ হয় নাই—তাঁহার জীবনবৃক্ষে ফল ফলে নাই—তিনিই যথার্থ বন্ধ্যা।

(৫) মনুষ্যের চক্ষু মনুষ্যেরই কার্যের উপযুক্ত। উহা দূরবীক্ষণ হইলেও দোষ—অনুবীক্ষণ হইলেও দোষ। গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহিণীকে কর্তব্য দেখাইয়া দিবেন—উদ্দেশ্য স্থির করিয়া দিবেন—আর কিছুই করিবেন না। ঔদার্য রক্ষা করিতে গিয়া সতর্কতা ত্যাগ করিতে নাই—সতর্ক হইতে গিয়া নীচ হইয়া পড়িতে নাই।

যেহেতু ভূদেবের পরিবার-চিন্তা একান্ন পরিবারকে নিয়েই, তাই জ্ঞাতিত্ব কুটুম্বতা, অতিথি সেবা, চাকর-প্রতিপালন, প্রিতামহঠাকুর, পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, পুত্রবধূ, কন্যাপুত্রের বিবাহ, নিরপত্যতা, সন্তান পালন, সন্তানের শিক্ষা, দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবেই আলোচ্য গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে।

'একান্নবর্তিতা' প্রবন্ধের মূলকথা বিখ্যাত পজিটিভিস্ট যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের 'একান্নবর্তী পরিবার' প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে অনেকাংশে মিলে যায়। দুজনেই একান্নবর্তী প্রথার দোষ দেখিয়েছেন এবং বলেছেন—অনিবার্য যুগধর্মেই

একান্নবর্তী পরিবারের মূল্যবোধ নষ্ট হচ্ছে, আবার দুজনেই একান্নবর্তিতার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করেছেন।

'একান্নবর্তিতা'-রও অনেক গুণ আছে। কৃষিপ্রধান দেশে এবং দরিদ্রতার বাহুল্যে যে একান্নবর্তিতার একান্ত প্রয়োজন এবং অবশ্যম্ভাবিতা আছে, সেকথার কোন উল্লেখ না করিয়াও একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে অনেকানেক ধর্মভাবের বিশেষ উন্মেষ এবং সংরক্ষণ হয় তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। প্রধানের নিকট বশ্যতা অতি বড় গুণ। ইহা একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে সুশিক্ষিত হয়। পরার্থে নিজের উপার্জিত ধনাংশের নিয়োগে যে স্বার্থ সংকোচের অভ্যাস হয়, সেটিও সামান্য গুণ নহে। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে এই গুণটিরও অভ্যাস হয়। ফলত বশ্যতা, ত্যাগশীলতা, সমদর্শিতা প্রভৃতি অনেকানেক মূল ধর্মের শিক্ষা একান্নবর্তিতার ফল এবং ঐ সকল ফল জন্মে বলিয়াই আমাদিগের দেশে উহার এতটা প্রশংসা হইয়া আসিয়াছে।'

ভূদেব একান্নবর্তী পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিদের জন্য একটি আচরণ বিধিও তৈরি করেছেন, যাতে 'শুভ ফলই অধিক হয়।'

(১) প্রত্যেকেই কিছু উপার্জনের চেষ্টা করবেন, কারো গলগ্রহ হওয়া উচিত নয়।

(২) যিনি সবার বড় তাঁকে মান্য করা উচিত,

(৩) প্রত্যেকের আয় গৃহকর্তার হাতে দেওয়া উচিত,

(৪) গৃহকর্তা সকলের সঙ্গে পরামর্শ করবেন, খরচ-পত্রের নিখুঁত হিসাব রাখবেন, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি হবেন।

(৫) আয়ের উদ্বৃত্ত অর্থ পরিবারের ব্যক্তিবর্গের আয় অনুসারে নিজ নিজ সম্পত্তিরূপে গণ্য হবে।

ভূদেব একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর অভিমত ব্যাখ্যা করেছেন। সেটি কৌতুহলোদ্দীপক, তাই এখানে উদ্ধৃত হল।

রাম, হরি এবং কৃষ্ণ তিন ভাই—রামের বার্ষিক আয় ৩ হাজার, হরির ৪ হাজার এবং কৃষ্ণের ২ হাজার, সর্বশুদ্ধ ৯ হাজার। ইহাদিগের বাটির বার্ষিক ব্যয় ৪ হাজার, সুতরাং ব্যয় বাদে উদ্বৃত্ত ৫ হাজার। ঐ ৫ হাজারের মধ্যে—

(১) ৯ : ৫ :: ৩ : ১$\frac{৬}{৯}$=১$\frac{২}{৩}$ হাজার, রামের নিজ সম্পত্তি।

(২) ৯ : ৫ :: ৩ : $\frac{২}{৯}$=২$\frac{২}{৯}$ হাজার, হরির নিজ সম্পত্তি।

(৩) ৯ : ৫ :: ২ : ২/৯=১২/৯ হাজার, কৃষ্ণের নিজ সম্পত্তি।

পারিবারিক বিচ্ছেদ যাতে না ঘটে, সকলের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় থাকে, সেজন্যই অর্থকরী ব্যাপারে নিরপেক্ষতা এবং ভবিষ্যৎ সংস্থানের উপর লেখক জোর দিয়েছেন। প্রাচীন একান্ন পরিবার প্রথা আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের আক্রমণে ভেঙে না পড়ে, সেদিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু উপার্জনক্ষম বহু সদস্যযুক্ত পরিবারের প্রকৃত জটিলতা তিনি ধরতে পারেন নি। রাম, হরি ও কৃষ্ণ কেবল তিনজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি নয়, স্বাধীন চিত্ত বৃত্তি বিশিষ্ট তিনজন মানুষ। যে আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর মধ্য দিয়ে রাম হরি কৃষ্ণ উপার্জনের যোগ্যতা লাভ করেছে, সেখানে কোথাও একান্নবর্তিতা রক্ষার তাগিদ নেই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উনিশ শতকীয় নবজাগরণের প্রধান লক্ষণ। ব্যক্তির স্বীকৃতি যেখানে শ্রেয়সের মর্যাদা পায়, সেখানে জ্যেষ্ঠের অবিসংবাদিতা রক্ষিত হওয়া কঠিন। তা ছাড়া, নির্ধারিত ব্যয়ের তুলনায় আয় অনেক বেশি, এমন পরিবারের হিসাব প্রকৃতপক্ষে খুব কম পরিবারের সঙ্গেই মেলে।* একান্নবর্তিতার নিশ্চিত সুফল প্রমাণের অতিশয় আগ্রহে এখানে ভূদেব সমস্যার সরলীকরণ করেছেন মাত্র। অবশ্য ভূদেবের চিন্তাধারায় সঙ্গতির অভাব ঘটেনি। 'স্ত্রীশিক্ষা,' 'পুত্রকন্যা' 'পুত্র বধূ' পরিচ্ছেদ তিনটি পড়লে তাঁর পরিবার কল্পনার সমগ্রতা বোঝা যায়। সব কিছুই যদি কেউ শৈশব থেকে ভাবতে শেখে, 'যেমন বাপের বাড়ি কিছুই নয়—শ্বশুর বাড়িই বাড়ি,' আবার যে পরিবারে নববধূর প্রবেশ হবে, সেই পরিবারও মেনে চলবেন ভূদেবের নির্দেশ : 'স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয় অপেক্ষা অধিক সম্মানে রাখিতে হয়, বিলক্ষণ সমাদর এবং যত্ন করিতে হয়।' তাহলেই একান্নবর্তী পরিবারের যৌথ জীবনবোধে ভাঙন ধরবে না। 'ছেলেমেয়ে বৌ-জামাই বাড়ি-বাগান ধন-জন সকলি তোমার—আমিও তোমার—ও সব তোমার বলেই আমার'।—এইটি গৃহবধূ মাত্রেরই মূলমন্ত্র হলে কোন সমস্যার উদ্ভব হয় না।

কিন্তু বাস্তবে কোনকালে কি এই 'স্ত্রীশিক্ষা,' 'সন্তানশিক্ষা,' 'পুত্রবধূ' 'একান্নবর্তিতা' প্রভৃতির আদর্শ সর্বাঙ্গীনভাবে গৃহীত হয়েছিল? ভূদেব মনু পরাশর উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলির দ্বারা প্রাচীন ভারতের ইউটোপিয়াকে জানা

*১৮৮৫ সালে উক্ত প্রবন্ধটি রচিত। সেকালে বড়ো রাজকর্মচারী ছাড়া দৃষ্টান্তে উদ্ধৃত বেতন-উপার্জনে খুব কম পরিবারই সক্ষম ছিল। আবার একই পরিবারে তিনজন ঐ ধরনের উপার্জনের দৃষ্টান্ত আরও কম।

যায় মাত্র। সামাজিক ইতিহাসের সাক্ষ্য ভিন্নরূপ। যে সেন আমল হিন্দু রাজত্বের স্বর্ণযুগ, কেননা সেন রাজাদের হাতেই বর্ণাশ্রম ধর্ম আরো বেশি মর্যাদা পেল, তাঁরা কি কৌলীন্যমোহে পারিবারিক সম্পর্কের মূল্যকে তুচ্ছ করেন নি? বহুবিবাহের যুগে বাল্যবিবাহ অভিসম্পাত, কুলীন স্ত্রীদের পক্ষে 'শ্বশুর বাড়িই বাড়ি' মনে করার সুযোগও বেশি ছিল না।

আট

ভূদেব একদিকে সনাতন প্রথার পূজারী, অন্যদিকে যুক্তিসম্মত দৃষ্টিতে নারী-নির্যাতনমুক্ত দাম্পত্য জীবন ও একান্ন পরিবার আকাঙ্ক্ষা করেন। বিধবা বিবাহে তাঁর সায় নেই, চিরকৌমার্য ও বৈধব্য—দুইই তাঁর কাছে পবিত্র সংযমের জন্য অর্চনীয়। অথচ দ্বিতীয় দারপরিগ্রহে তাঁর সমর্থন নেই, এমন কি অপত্যহীন পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহও তাঁর মতে অপ্রয়োজনীয়। এখানে ভূদেব সম্পূর্ণভাবেই আধুনিক, উনিশ শতকের বাঙালী সমাজের অগ্রসর বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীরই অংশীদার। তিনি স্ত্রী-পুত্র শূন্যতা অর্থে 'গৃহশূন্যতা' স্বীকার করেন না। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, 'স্ত্রীবিয়োগ হইলেই 'গৃহশূন্য' বলে। একথা কেন বলে? সত্য সত্যই ত স্ত্রীবিয়োগ হইলেই একেবারে গৃহটি শূন্য হয় না।' বহুবিবাহ অবিহিত নয়, তবে পশ্বাচার। সুতরাং তিনি কুলীনদের বহুবিবাহ সমর্থন করেন নি। 'গৃহশূন্যতা' ও 'পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ' প্রস্তাব দুটি একত্র মিলিয়ে পড়লেই ভূদেবের পরিবার-চিন্তার ধারণাটি প্রস্ফুট হয়। তিনি ধর্মবিশ্বাসী মানুষ, 'ধর্মচর্যা' গৃহে ধর্মাধিকরণ তাঁর কাছে ঐহিক সংসার যাত্রারই অপর পিঠ—সংসার কর্ম এবং ধর্মচর্যা পরস্পরের পরিপূরক। পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত সংসার ধর্ম রক্ষা অর্থাৎ পরিবারের সকলের প্রতি সমান কর্তব্যবুদ্ধি, সন্তান পালন এবং সৎভাবে জীবন যাপনের শিক্ষাপ্রবর্তন আদর্শ গৃহীর কাজ। তারপর তিনি অবসর নিয়ে বাকি জীবন ধর্মচর্চায় অতিবাহিত করবেন। এখন সে বন নেই, বানপ্রস্থও অপরিহার্য নয়। কিন্তু শাস্ত্রের মূলকথা পঞ্চাশোর্ধে সংসার ত্যাগ অর্থাৎ সংসারের আসক্তি ত্যাগ—এখনো তিনি করণীয় আদর্শ মনে করেন। পঞ্চাশের পূর্বেই যদি স্ত্রীবিয়োগ হয়, তবে তখন থেকেই তাঁর ধর্মচর্চার কাল বা বানপ্রস্থ।

প্রসঙ্গত ফরাসী সমাজ-দার্শনিক অগস্ত কোঁতের চিন্তাধারার সঙ্গে ভূদেবের সমাজ-চিন্তার তুলনা করা যায়। তিনিও মনুবিহিত সামাজিক অনুশাসন মানার

পক্ষপাতী ; আবার বহুবিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁর মতে যদি পুরুষের একাধিক বিবাহের অধিকার থাকে, তবে নারীরও একাধিক বিবাহের অধিকার থাকা উচিত। বস্তুত সামাজিক প্রবন্ধ বইটিতে ভূদেব বহুবার কোঁতের উল্লেখ করেছেন। অবশ্য কোঁতের সঙ্গে তাঁর মত-পার্থক্যও অত্যন্ত স্পষ্ট। ভূদেবের ধ্যানদৃষ্টিতে স্থিতি-আশ্রমবিধায়িনী লীলাময়ী, গৃহলক্ষ্মী, বরপ্রদায়িনী, হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবী দেখা দিয়েছেন, তিনি পুরাণের দশমহাবিদ্যা ও কোঁতের মানবতা দেবীর (গডেস্ অব্ হিউম্যানিটি) মিলিতরূপ।

এখানে স্মরণীয় যে ভারতবর্ষীয় কোঁত-পন্থী সভার মুখ্য পরিচালক যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ এবং বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র ভূদেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। অনেক দিন আপিসের পর ভূদেব খিদিরপুরে যোগেন্দ্র চন্দ্রের বাড়ি যেতেন এবং সেখানে পজিটিভিজম্-চর্চায় অনেক সময় অতিবাহিত হত। যোগেন্দ্র চন্দ্র বঙ্গদর্শনে লেখেন 'জাতিভেদ,' 'একান্নবর্তী পরিবার'। ক্যালকাটা রিভিউতে প্রকাশিত তাঁর 'দি কাস্টস্ ইন ইণ্ডিয়া,' 'আওয়ার জয়েন্ট ফ্যামিলি অরগানাইজেশন' প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং 'দি ব্রাহ্মনিজম্ এণ্ড শূদ্রস্' বইটির সঙ্গে ভূদেবের সামাজিক প্রবন্ধ-পারিবারিক প্রবন্ধ-আচার প্রবন্ধ সমষ্টির তুলনা চলে। যোগেন্দ্রচন্দ্র মানবতা দেবীর অনুসরণে শিশুকোলে মাতৃমূর্তিকে নারায়ণী বা গডেস্ অব্ হিউম্যানিটি রূপে প্রচার করতে চেয়েছেন। পারিবারিক প্রবন্ধের উৎসর্গে যে বিচিত্রমূর্তি দেবীর কথা আছে, তিনিও মানবতা দেবীরই অপর সংস্করণ। 'কিছুরই অভাব নাই—কিছুরই অস্থিরতা নাই। সকলই যথাযথ। যাহাতে দৃষ্টি করেন, তাহাই উথলিয়া উঠে। যাহাতে হাত দেন তাহাই শোভাময় হয়। ইতি—গৃহলক্ষ্মী।

'দেখিতে দেখিতে একটি একটি করিয়া কয়েকটি শিশুমূর্তি ঐ আরাম নিকেতনে দেখা দিল—উহাদিগের শরীরে তাঁহার এবং আমার উভয়ের অবয়ব একত্র সম্মিলিত দেখিলাম। হৃদয়, মমতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

ইতি—বরপ্রদায়িনী।

নয়

ভূদেব যখন আচার প্রবন্ধ লেখেন, তখন তাঁর মনে শাস্ত্র-বিহিত দশকর্ম সংস্কার হিন্দু মাত্রেরই অবশ্য পালনীয় কর্মরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। প্রাচীন বিধি-কর্তাদের যোগ্য উত্তরসাধকরূপেই তিনি সামাজিক ও পারিবারিক প্রবন্ধ

লিখেছেন। তবু ঐ দুটি গ্রন্থে লেখক ঐতিহাসিক বিচারবোধ, উদারতা এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছেন। আচার প্রবন্ধ-লেখকের দৃষ্টিতে সে উদারতা, ঐতিহাসিকতা, তুলনামূলক অপক্ষপাত বিচার নেই, প্রৌঢ় ভূদেব জীবনের শেষ পর্যায়ে একান্তভাবেই রক্ষণশীল হয়ে উঠেছেন। সামাজিক প্রবন্ধের যুক্তিমনস্কতা এখানে একেবারেই নেই।

পুরোহিত দর্পণ ও নিত্যকর্মপদ্ধতি জাতীয় গ্রন্থরূপে 'আচার প্রবন্ধ' সমষ্টির অবতারণা। প্রত্যূষে সাড়ে চারটার সময় শয্যাত্যাগ থেকে শৌচাদি প্রাতঃকৃত্য, পানাহার এবং চব্বিশ প্রহরে প্রতিপাল্য বর্গের প্রতি কর্তব্য বিশদ বর্ণিত হয়েছে।

নানা শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উপযুক্ত শ্লোক উদ্ধার করে এবং তার সরল ভাষ্য দিয়ে জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন, শ্রাদ্ধকৃত্য প্রভৃতি ব্যাপারেও লেখক সুবিহিত নির্দেশ দিয়েছেন।

ভূদেব তাঁর পৌত্র ও দৌহিত্রদের বইটি উৎসর্গ করেছেন এই ভরসায়— 'তোমাদের ও তোমাদের ন্যায় স্বদেশীয় যুবক ও বালকবৃন্দের আচার শিক্ষা আনুকূল্যে এবং স্বজাতীয় পরম পবিত্র শাস্ত্রের মহত্ত্ব উপলব্ধি সাহায্যে' সহায়ক হবে। সব বইতেই তাঁর একটি আশংকা প্রকাশ পেয়েছে—ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে বুঝি আমাদের নিজস্ব জীবনচর্যার অবমাননা এবং অবলোপ ঘটে। তবু 'সামাজিক প্রবন্ধে' ভূদেব অনেক সংস্কারমুক্ত। কিন্তু এই গ্রন্থে যেন একালের সমাজ সংঘর্ষের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি প্রাচীন শাস্ত্রকারের পক্ষে প্রবন্ধগুলি লিখেছেন। সামাজিক প্রবন্ধের উৎসর্গপত্রে আছে: 'ইংরাজী শিক্ষিত এতদ্দেশীয় প্রৌঢ় এবং যুবকদিগকে মানস-চক্ষে রাখিয়া সমাজ-তত্ত্ব বিষয়ে স্বচিন্তার উদ্রেক করিবার অভিলাষে এই প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছি।' এখানে দেশীয়-সমাজের যাবতীয় ত্রুটির জন্য বিদেশী শিক্ষাকে দায়ী করা হয়নি। এ্যারিস্টটল, কোপারনিকাস, হার্বাট স্পেনসার, অগস্ত কোঁত, ডারউইন প্রভৃতি মনীষীদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আচার প্রবন্ধের ভূমিকায় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রতি বিরূপতা স্পষ্ট। তাঁর মতে, দেশীয় সমাজের সদাচার ভ্রংশের জন্য বিদেশী শিক্ষাই দায়ী।

আচার প্রবন্ধের উৎসর্গ পত্রে আছে:

'দেশীয় পরম পবিত্র সদাচার পালন ইহ এবং পারলৌকিক হিতসাধন পক্ষে কিরূপ কার্য্যকরী তাহার জ্ঞান বিদেশীয় শিক্ষার প্রাবল্যে এবং সভক্তিক শাস্ত্রশিক্ষার ত্রুটিতে দেশমধ্যে ন্যূন হইবার উপক্রম হইতেছে।' তাঁর

লক্ষ্য, যেন একালের যুবকদের মধ্যেও প্রাচীন আদর্শ ('পরম ধন') 'অবিকৃতভাবে থাকিয়া যায়।'

উপক্রমণিকাধ্যায়ে (ছোট হরফের ২৭ পৃষ্ঠা) সমগ্র গ্রন্থটির বিষয়-সংকেত আছে।

ধর্মোহস্য মূলান্যসবঃ প্রকাণ্ডো
বিত্তানি শাখাচ্ছদমানি কামাঃ।
যশাংসি পুষ্পানি ফলঞ্চ পুণ্যং
তসৌ সদাচার— তরুর্মহীয়ান্।

এই শ্লোকটিকে পাঁচটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। (১) 'ধর্মোহস্য-মূলানি'—সদাচারের মূল ধর্ম, ধর্ম অর্থে শাস্ত্রীয়বিধির প্রতিপালন, (২) 'অসবঃ প্রকাণ্ডঃ'—সদাচার মহাবৃক্ষের কাণ্ড হচ্ছে আয়ু, সদাচারে মানুষের আয়ু বাড়ে, (৩) বিত্তানি শাখা, চ্ছদমানিকামাঃ'—সদাচার বৃক্ষের শাখা ধন, কামনাগুলি তার পাতা, (৪) 'যশাংসি পুষ্পানি'—সদাচার বৃক্ষের পুষ্প যশ—সদাচারী লোক যশোভাগী হন, (৫) 'ফলঞ্চ পুণ্যং'—সদাচার বৃক্ষের ফল পুণ্য। চারটি অধ্যায়ে নিত্যাচার প্রকরণ, সাতটি অধ্যায়ে নৈমিত্তিকা বর্ণনা করা হয়েছে। দুটি প্রকরণেরই উপসংহার ও পরিশিষ্ট আছে। ভূদেব আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে উৎসব-পার্বণে শাস্ত্রবিহিত আচরণীয় বিধি এবং অনাচরণীয় নিষেধ বাক্যগুলি সংগ্রহ করে একালের উপযোগী ব্যাখ্যাসহ উপস্থিত করেছেন। প্রাতঃকৃত্য, পূর্বাহ্নকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন ও রাত্রিকৃত্য অধ্যায়গুলিতে শয্যাত্যাগ, ঈশ্বর স্মরণ, শৌচ-আচমন, স্নান, ত্রিসন্ধ্যা, বেদাভ্যাস, প্রতিপালন, দেবপূজা, হোম-বলি, অতিথি সংকার, নিত্যশ্রাদ্ধ, পানাহার, ইতিহাস-পুরাণ-ধর্মশাস্ত্র চর্চা, দ্বারোদ্‌গম বিষয়ে বিশদ বিবৃতি আছে। কিরূপ আচমন শ্রেয়, কিরূপ দন্তধাবন অসঙ্গত, অতিথি সংকারের আদর্শ পন্থা কি, দিবানিদ্রা কেন অসমীচীন প্রভৃতি অনপুঙ্খ ব্যাপারেও তিনি শাস্ত্র-নির্দেশ অনুসরণ করেছেন।

ভূদেব শাস্ত্রকে এখানে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। কেবল বেদ-উপনিষদ নয়,—গীতা মনুসংহিতা রামায়ণ আয়ুর্বেদ পুরাণ সব কিছুকেই আর্যশাস্ত্রের মর্যাদা দিয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁর বিরূপতা কয়েকটি উক্তিতে বেশ স্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত। ইংরেজি শিক্ষিত, ইংরেজ অনুকারী দেশীয় সমাজ বা য়ুরোপীয় সমাজের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাবও প্রচ্ছন্ন নয়। বস্তুত ইংরেজিয়ানার প্রভাবে সনাতন আর্যসমাজের সদাচার-ভ্রষ্টতা তাঁকে ব্যথিত

করেছিল। উনিশ শতকের শেষ দশকে কোন কোন বিষয়ে নব্যপন্থীদের পাশ্চাত্ত্য মোহমুক্তি ঘটছে দেখেই তিনি ভরসা পেয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে হিন্দুসদাচারবিধির একটি সরল কোষগ্রন্থ (হ্যাণ্ডবুক) রচনা করলে ভবিষ্যতের তরুণ সমাজ উপকৃত হবে।

'এখন ইংরাজিতে কথা কহিবার সাধ, পেণ্টেলুন হ্যাট পরিবার সাধ, টেবিলে বসিয়া খানা খাইবার সাধ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। ঐ সকল সাধ যেমন হিন্দু কালেজের প্রথম ছাত্রদলের মধ্যে ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি· এ·-এম· এ—প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও তেমন নাই। বিলাত-ফেরত দিগের মধ্যে ঐ সকল সাধ এবং বিবি লইয়া বাহিরে বেড়াইবার নূতন সাধটি সম্প্রতি বাড়িয়াছে, কিন্তু ধর্মসংস্কারের সাধটা নাই বলিলেই হয়—বোধ হয়, উহাদেরও সংখ্যা আর কিছু বাড়িলে ওরূপ সকল সাধই মিটিয়া যাইবে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে এমন একটি সদাচারকোষ বিষয়ের গ্রন্থ তিনি প্রয়োজন মনে করেছেন, যেটি অনুশীলন করলেই যাবতীয় সংসার কর্মে ও ধর্মে আচরণীয় সূত্রগুলি হাতের কাছে পাওয়া যায়। 'আচার প্রবন্ধ' সেই প্রয়োজন মিটিয়েছে। লৌকিক বাস্তব সংসারের খুঁটিনাটি অনুষ্ঠানে, স্মার্ত সংস্কারে, সেগুলির পৌরাণিক ব্যাখ্যায় তিনি আমাদের সনাতন ঐতিহ্যের পথ নির্দেশ করেছেন। কয়েকটি নির্দেশবাক্য উদ্ধৃত করলেই ভূদেবের মানসিকতা স্পষ্ট বোঝা যাবে ঃ

এক· আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে মুখরজ্জু, ইন্দ্রিয়গণকে অশ্বস্বরূপ জানিবে। (উপক্রমণিকাধ্যায়। পৃ-৫)

দুই· দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র হউক আর বিদেশীয় বিজ্ঞানই হউক, আর অপর দেশীয় লোকের আচারই হউক, কেহই আমাদিগের স্মৃত্যুক্ত আচার বিধিগুলির ন্যায় সর্বদিকদর্শী এবং সর্বতোভাবে আমাদিগের উপযোগী হইতে পারেনা। (উপক্রমণিকাধ্যায়। পৃ-১৩)

তিন· হে লোকেশ! হে চৈতন্যময়! হে আদি দেব! হে শ্রীকান্ত! হে বিষ্ণু! তোমার আজ্ঞানুসারী হইয়া তোমারই প্রীত্যর্থে এই প্রাতঃকালে উঠিয়া আমি সংসার যাত্রার অনুবর্তন করিব। (প্রাতঃকৃত্য। পৃ-৩১)

চার· রজোগুণাবলম্বী য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকে বলিয়াছেন যে লোকের ভোগবাসনা বৃদ্ধি হইলে তাহারা আর বিবাহ করিতে চাহে না, কারণ বিবাহ হইলেই বংশবৃদ্ধি হইয়া গৃহস্বামীর ব্যয়বাহুল্য হয় এবং তিনি অনেক ভোগসুখে

বঞ্চিত হইয়া পড়েন। এইজন্য বিলাসিতা বৃদ্ধিতে সমাজের লোক সংখ্যার অতিবৃদ্ধি নিবারণ করিয়া রাখে। কিন্তু আর্যশাস্ত্র লোকসংখ্যার অতি বৃদ্ধি নিবারণের উদ্দেশে বিলাসিতা বৃদ্ধিরূপ অতি অনিষ্টকর উপায় অবলম্বন করেন নাই—বিবাহ দ্বারা বংশরক্ষার উপায় বিধান করিয়া অযথারূপে বংশবৃদ্ধির নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। সর্বস্থলেই আর্যশাস্ত্রের দৃষ্টি যেমন সুদূরগত, তদনুষ্ঠিত প্রণালীও তেমনি অতীব পরিশুদ্ধ। (অপরাহ্ন, সায়াহ্ন এবং রাত্রিকৃত্য। পৃ-১০৭)

পাঁচ. সকল দিক দেখিলে অতি সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হইবে যে ভারতবাসীগণ পৃথিবীর মধ্যে পাণ্ডবস্থানীয় হইয়াছেন। ইঁহারা কষ্ট পাইতেছেন, হয়তো মরিয়া যাইবেন, তথাপি সাধু। (নিত্য চারপ্রকরণের উপসংহার। পৃ-১১৫)

দশ

ওপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে প্রমাণিত হয়, লেখকের কাছে উপনিষদ মহাভারত পুরাণ তন্ত্র স্মৃতি—সবই শ্রৌত শাস্ত্রের মত আপ্তবাক্য। পুরাণ অথবা তন্ত্র অথবা স্মৃতি এইরূপ বলে, এই কথাই তাঁর কাছে যথেষ্ট, তর্কসিদ্ধ যুক্তির মতই নিঃসংশয়ে গ্রাহ্য। স্বভাবতই তাতে মতভেদের অবকাশ আছে। বহু ক্ষেত্রে স্মৃতি ও তন্ত্রের নির্দেশ পরস্পর বিরোধী। সে ক্ষেত্রে কোন্‌টি আর্যশাস্ত্ররূপে গণ্য? যেমন মনুর বিধানে আছে, মাতা-পিতা, গুরুভার্যা, সন্তান, দরিদ্র, আশ্রিত, অভ্যাগত, অতিথি, সাগ্নিক, এবং পোষ্যবর্গের জন্য ব্রাহ্মণ ছয়টি মুখ্যবৃত্তি গ্রহণ করবেন, না পারলে কুষীদ কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতিও করতে পারেন। এমন কি ঋষিদের মতে কুষীদ গ্রহণই উৎকৃষ্ট। আধুনিক কালে কৃষি ও বাণিজ্যের সৎ-পরিশ্রমের উপার্জনের তুলনায় কুষীদ-জীবিকা ক'জনের কাছে শ্রেয়োতর মনে হবে? অর্জনের সিকি ভাগ পারলৌকিক হিতসাধনে, অর্ধেক নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ায়, বাকি সিকি ভাগের অর্ধের অর্ধ মূলধনে যোগ করা নাকি শাস্ত্র বিহিত। (পূর্বাহ্ন কৃত্য। পৃ-৫৫) কিন্তু শাস্ত্রমতে যাঁরা পরিবারের পোষ্যবর্গ, তাঁদের প্রতিপালনে তাহলে অবহেলা ঘটতে বাধ্য। এখানে একটি আইডিয়াল কনডিশান ধরে নেওয়া হয়েছে যে, সব শাস্ত্রবিহিত ব্যয় নির্বাহ করেও কিছু অবশিষ্ট থাকবে। যাঁর থাকবে না তিনি মূলধন বৃদ্ধি করতে পারবেন না এবং অর্ধের অর্ধ মূলধন সংযোগের তাগিদে অনেকেই

পোষ্য প্রতিপালনে কিঞ্চিৎ অনুদার হতে পারেন। বস্তুত আদর্শ প্রতিপালন-রীতি এবং সঞ্চয়ের মধ্যে সীমারেখা টানা দুরূহ।

ভূদেব বলেছেন, সকাল 'নটা হইতে সাড়ে দশটা পর্যন্ত পোষ্যবর্গের নিমিত্ত অর্থ সাধন চেষ্টা করিবে।' পূর্বে নাকি 'দেড় ঘণ্টাকাল মাত্র যত্ন করিলেই পর্যাপ্ত অর্থচিন্তা হইত,' তাহলে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অর্থ চিন্তা কারা করতেন? অন্তত কৃষিজীবীরা যে করতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর কুষীদ কৃষি ও বাণিজ্য যখন ব্রাহ্মণের পক্ষে অকার্য নয়, তখন যাজন, অধ্যাপন এবং প্রতিগ্রহ ছাড়া বাকি পন্থায় সকলকেই নিশ্চয় দেড় ঘণ্টার অনেক বেশি অর্থসাধন চেষ্টায় নিরত থাকতে হত। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখেছেন, 'দামুন্যায় চাষ চষি নিবসে পুরুষ ছয় সাত।' কবি কালকেতুর আদর্শ রাজ্যেও শাস্ত্রজ্ঞ যজন-যাজনশীল ব্রাহ্মণের পাশাপাশি অযোগ্য বিপ্রের কথাও বলেছেন (মুর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে)। সুতরাং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে বর্ণাশ্রম অনুমোদিত আচার-আচরণে অনীহা জাগার অনেক পূর্বেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের আচারভ্রংশ ঘটেছিল। জীবন যাপনের অনিবার্য তাগিদেই এরূপ হয়েছিল।

গার্হস্থ্য জীবনের কিছু দৈনন্দিন সমস্যা বিষয়েও ভূদেব কিছু নির্দেশ দিয়েছেন। ত্রিসন্ধ্যা স্নান, শাস্ত্র পাঠ, আহারান্তে দিবানিদ্রা নিষেধ, স্নানের পূর্বে শরীরের নীচে থেকে উপরের দিকে তৈলষেক, রবিবার ও মঙ্গলবারে তৈলষেক নিষেধ, খদিরাদি গাছের ডালের দাঁতন বিধি, জন্মদিন বিবাহ-পাল-পার্বণে দাঁতননিষেধ ইত্যাদি। নিত্যপূজার মধ্যে তিনি শিব বিষ্ণু এবং কুলদেবতার পূজাকেই আবশ্যিক বলেছেন।

এগার

একালের পাঠকের মন এইসব প্রাচীন আচারে আর পূর্বের মহিমা আরোপ করতে চান না। বিজ্ঞান চর্চার অবশ্যম্ভাবী ফল হল কার্যকারণবোধ। ভূদেবের পূর্বেই অক্ষয়কুমার দত্ত একটি ফরমুলা চালু করেছেন: ঈশ্বরের আশীর্বাদ + পরিশ্রম = শস্য, ঈশ্বরের আশীর্বাদ − পরিশ্রম = শূন্য। গভীর ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং উপাসনানিষ্ঠ হয়েও অক্ষয়কুমার ছিলেন যুক্তি-প্রবণ। তাঁর মতে যা অযৌক্তিক তা শাস্ত্র বিহিত ধর্ম নয়। ভ্রান্ত সংস্কার মাত্র। কিন্তু ভূদেব নির্বিচারে যাবতীয় নিত্য-নৈমিত্তিক আচারগুলিকে অবশ্য পালনীয় এবং

স্বাজাত্যবোধক মনে করেন। অবশ্য কোন কোন ব্যাপারে তাঁর মনেও সন্দেহ জেগেছে। যেমন শাস্ত্রে আছে—অশ্নীযাওম্মনা ভূত্বাপর্বন্তু মধুরংরসং। লবণাম্লৌ তথামধ্যে কটুতিক্তাদিকং তথা। ভূদেবের মন্তব্য. 'বঙ্গদেশে ভোজনের উল্লিখিত ক্রম রক্ষা হয় না। পঞ্জাব প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা উল্লিখিত শাস্ত্রমতানুবর্তী হইয়া চলেন।' (মধ্যাহ্নকৃত্য। পৃ-৬৯) তাহলে কোনটি আচরণীয়? স্পষ্টত তিনি শাস্ত্রাচার নির্দেশ না নিয়ে এখানে লোকাচারকেই মেনে নিয়েছেন। তাঁর আর একটি মন্তব্য: 'ভোজনকালে মৌনী হওয়া আমাদের শাস্ত্রের বিধি। য়ুরোপীয়দিগের ব্যবহার ইহার বিপরীত। প্রকৃত প্রস্তাবে মাংস পরিপাক করিতে লালার প্রয়োজন তত বেশী হয় না, এজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে মাংসভুক জন্তুরাও ভোজনকালে গরগর করিয়া শব্দ করে, উদ্ভিদভোজিগণ তাহা না করিয়া নিঃশব্দেই ভোজন করিয়া থাকে।' (মধ্যাহ্ন কৃত্য। পৃ-৬৭)

এখানে ভূদেব শাস্ত্রীয় আচারের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের সত্যকে অস্বীকার করেছেন। আহার্য পরিপাকের জন্য লালাক্ষরণ সর্বদা প্রয়োজনীয়, নিরামিষ আমিষ নির্বিশেষে।

লেখক এতখানি প্রাচীন সংস্কারের বশবর্তী যে বিশেষ বিশেষ দিনে দাঁত না-মাজার নির্দেশও সমর্থন করেছেন। বলা বাহুল্য, এখানে কোপারনিকাস ও গোলাধ্যায়ের ঐক্যসন্ধানী ভূদেবের পরিচয় পাইনা। সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত নৈমিত্তিকাচার প্রকরণ যেন কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের 'দশকর্ম বিধি' গ্রন্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতকর্ম থেকে শ্রাদ্ধকৃত্য পর্যন্ত বিবৃত হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ের ভিত্তি রঘুনাথ শিরোমণির কৃত্যতত্ত্ব। 'অন্যান্য অধ্যায়ের ন্যায় এই অধ্যায়ের প্রধান অবলম্ব স্মার্তশিরোমণির অষ্টবিংশতিতত্ত্ব। ভূদেব চেয়েছেন, আধুনিক ভারতবর্ষ যখন য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতি বিমুখ হবে, তখন এইসব স্মার্ত ব্রত পূজা ও পর্ব পালিত হবে। ২৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত পরিশিষ্ট-বিবরণটি সপ্তম অধ্যায়েরই উপসংহার। আধুনিক কোষগ্রন্থের ধরণে লেখক ব্রত ও পূজার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। নীচে তার কিছু নমুনা দেওয়া গেল।

মাস ও তিথি	ব্রত বা পূজার নাম	কোন দেবতা উপলক্ষে	কোন প্রদেশে কিভাবে চলে
জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দশমী	দশহরা	গঙ্গা	লোকেরা পাখা হাতে বনে যাইয়া ষষ্ঠি অথবা গৌরীর পূজা করে। এইদিনে- জামাতার সমাদর অস্মদ্দেশে প্রসিদ্ধ।

মাস ও তিথি	ব্রত বা পূজার নাম	কোন দেবতা উপলক্ষে	কোন প্রদেশে কিভাবে চলে
			আরণ্য ষষ্ঠী ব্রতকথায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে মৃতবৎসার জীবিতসন্তান হইলে তাহাকে যৎপরোনাস্তি সমাদর করিতে হয়। সর্বদেশে প্রচলিত; বাংলা ও উৎকলে গঙ্গাপূজার সঙ্গে মনসাপূজাও করিয়া থাকে। এইদিনে গঙ্গাস্নানে দশবিধ পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে এবং গঙ্গার অবতরণ হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। হিমানী সংঘাত দ্রবীভূত হইয়া গঙ্গায় যে জল বৃদ্ধি হয়, স্থূলতঃ তাহা দশহরার সময় হইতেই হয় বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে গঙ্গার জলবৃদ্ধি যে পর্বাহসূচক হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য নাই। মিশরের নীলনদের জলবৃদ্ধি আরম্ভ হইলেই তথায় লোকে মহোৎসবে প্রবৃত্ত হয়। যে-স্থলে অন্য জাতীয়েরা উৎসব করে, ভারত-বাসীরা উপবাস ও পূজা করিতে শিক্ষিত।
জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	স্নানযাত্রা	জগন্নাথদেবের স্নান, বিষ্ণু পূজা	এইদিনে বাংলায়, বিশেষত উৎকলে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মহাসমারোহ হইয়া থাকে। দ্রাবিড়াদি আর সর্বত্রই এই তিথিকে মন্বাদি বলে।
আষাঢ় শুক্ল দ্বিতীয়া	রথযাত্রা	জগন্নাথদেবের রথারোহণ, বিষ্ণু, পূজা	বাংলা, জম্বু, মহারাষ্ট্র ও উৎকলে প্রচলিত। এই দ্বিতীয়ায় বাংলায় মনোরথদ্বিতীয়ার ব্রত হইয়া থাকে। এই ব্রতের পূজ্য দেবতা কৃষ্ণ। দ্রাবিড়ে ও ত্রৈলিঙ্গে ইহাকে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া কহে। রথযাত্রা যে সূর্যের উত্তরায়নের সীমাপ্রাপ্তির পর দক্ষিণায়নে সঞ্চরণসূচক তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

মাস ও তিথি	ব্রত বা পূজার নাম	কোন দেবতা উপলক্ষে	কোন প্রদেশে কিভাবে চলে
ভাদ্র শুক্ল ষষ্ঠী	চপেটা ষষ্ঠী	ষষ্ঠী	বাঙ্গলায় চপেটা ষষ্ঠী। মিথিলায় পর্পট ষষ্ঠী। মহারাষ্ট্রে সূর্য ষষ্ঠী। অন্যত্র প্রচলিত নহে।

বারো

আচার প্রবন্ধ বইটিকে সামাজিক ও পারিবারিক প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে দেখা যায়। অন্তত লেখকের যে সেইরূপ অভিপ্রায় ছিল তার প্রমাণ মেলে উপক্রমণিকাধ্যায়ে। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে পূর্বের দুটি বইয়ের তুলনায় আচার প্রবন্ধের আবেদন ভিন্ন ধরনের। কেবল বর্ণহিন্দু বাঙালীকে সনাতন সদাচার প্রণালী শিক্ষা দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য। তাই ঘুম থেকে উঠে কি কি করা উচিত, দুপুরে ও সন্ধ্যায় কি করনীয়, বিভিন্ন প্রহরে বিভিন্ন হিন্দু দেবতার পূজাবিধি, স্বাস্থ্যরক্ষা, ঔষধ পথ্য এবং শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের অতিশয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। সামাজিক প্রবন্ধে ভূদেব জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টান সকলের কথা ভেবেছেন। তাঁর সহিষ্ণু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অন্য দেশের মুসলমান ও খ্রীষ্টানের তুলনায় এদেশের মুসলমান খ্রীষ্টানরা অনেকখানি ভারতীয় সমাজের অনুকূল। তার ফলে ইংরেজের 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' নীতির বিরুদ্ধে ধর্ম-নির্বিশেষে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা মোটেই অসম্ভব নয়।

জাতীয়ভাব অধ্যায়ের 'ভারতবর্ষে মুসলমান' এবং 'ভারতবর্ষে খৃষ্টানাদি' অংশ দুটি বিশেষত স্মরণীয়।

> 'ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসী জনগণের মধ্যে অপর যতই পার্থক্য থাকুক ইহার সকল ভাগেরই লোকদিগের চিত্তে একটি চমৎকার উদারতা আছে। ইহারা পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা পরকে আপনার করিয়া লইতে পারে।' (পৃ-৭)

দেখা যাচ্ছে, কেবল হিন্দু সমাজের প্রতি ভূদেবের দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়। তিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি সবাইকে নিয়েই জাতীয় ঐক্যের স্বপ্ন দেখেছেন। আধুনিক য়ুরোপের ইতিহাস থেকে ভূদেব শিক্ষা নিয়ে জেনেছেন, 'ইংলণ্ডেও যেমন ধর্মভেদ জাতীয় ভাবের ব্যাঘাত করিতেছে না, ... ভারতবর্ষেও সেইরূপ

হইয়া আসিতেছে। এখানকারও হিন্দু ও মুসলমান ক্রমে ক্রমে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত হইয়া মিলিবে।' (পৃ-১৩) ইংরেজ আমলের পূর্বে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। তিনি অভিজ্ঞতা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ছাপরা নিবাসী কয়েকজন ব্রাহ্মণ নাকি একজন শ্রদ্ধেয় মৌলবী সম্বন্ধে বলেছিলেন, তাঁর উচ্ছিষ্ট খেলেও ব্রাহ্মণের পবিত্রতা নষ্ট হবে না। (পৃ-১৬)

যেমন এদেশের মুসলমানরা ধর্মগুরু খলিফাকে মানলেও আচার আচরণে ভারতীয় হিন্দু সমাজের অনেক কাছাকাছি, তেমনি ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানরা বা ইঙ্গ ভারতীয় খ্রীষ্টান সমাজ একই বৃহৎ ভারতীয় সমাজের অন্তর্গত। ভূদেব লক্ষ্য করেছেন, ইংরেজ শাসকবর্গের ভাষা, ধর্ম ও পরিচ্ছদ গ্রহণ করলেও 'কৃত খ্রীষ্টানেরা কোন বিশেষ অধিকার পায় নাই, অপর সকল ভারতবাসী যে পরিমাণে ঘৃণিত এবং অবজ্ঞাত হইয়া আছে উহারাও সেইরূপ আছে।'

'আচার প্রবন্ধ' সমষ্টিতে বারবার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রতি লেখক ধিক্কার জানিয়েছেন। কিন্তু সামাজিক প্রবন্ধে তিনি অতটা পাশ্চাত্ত্য বিরোধী নন। বরং তিনি জাপানের দৃষ্টান্ত মনে রেখে পশ্চিমের কারিগরী বিদ্যাকে চেয়েছেন —য়ুরোপীয় কারিগরদের বাদ দিয়ে। অর্থাৎ রামমোহনের সময় থেকে এদেশে ইংরেজদের বসবাস বা 'কলোনাইজেশন' একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। রামমোহন ছিলেন কলোনাইজেশনের পক্ষে। ভূদেব তার বিরোধী। বিদ্যা সকলের, সার্বভৌম। জাপান য়ুরোপের বিজ্ঞানের দান নিয়ে দেশের অর্থনীতিকে য়ুরোপের প্রতিস্পর্ধী করে তুলেছে; অথচ সেখানে য়ুরোপীয় বিজ্ঞানী-কারিগরদের বসবাসের প্রশ্নটি মর্যাদা পায় নি। ভূদেবের দূরদর্শিতা এখানে লক্ষণীয়। ভিন্নধর্মী সমাজের মধ্যেও তিনি জাতীয়ভাবের অনুকূল আচারসাম্য দেখেছেন।

উপসংহার : সমাজচিন্তা

তিনটি প্রবন্ধের বই এবং কিছু প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধাবলী থেকে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সমাজচিন্তার বিশদ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, ভূদেবের মূল্যায়নে উভয়পক্ষই ভুল করেছেন। যাঁরা ইংরেজী শিক্ষা এবং য়ুরোপীয় ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব চর্চার পক্ষপাতী, তাঁরা ভূদেবকে শশধর তর্কচূড়ামণি এবং তাঁর শিষ্য অনুসারক চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রমুখ বঙ্গবাসী গোষ্ঠীর সমগোত্রীয় বলে ভেবেছেন। এ· গোষ্ঠীর লেখকদের ব্রাহ্মবিদ্বেষ মোটেই ভূদেবের ছিল না। অথচ এই রক্ষণশীল গোষ্ঠীর ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের প্রতি আক্রমণে ব্রাহ্মমতের লেখকরাও ভূদেবের প্রতি অবিচার করেছেন। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। পরে দুই বিবদমান গোষ্ঠীর (একদল সনাতনী হিন্দুধর্মের সবকিছুই পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষে, অপর দল ব্রাহ্ম-সংস্কারক এবং বিদ্যাসাগরপন্থী) সংঘর্ষে ঐতিহাসিক মাত্রা বিপর্যস্ত হল।

১৩৩৪ সালে 'ব্রাহ্মণ সমাজ' পত্রিকা যোড়শ বর্ষে পদার্পণ করে। ঐ বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় ভূদেবের 'আচার প্রবন্ধ' অনুসরণে বনওয়ারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন 'আচার তত্ত্ব।' তাছাড়া পঞ্চানন তর্করত্নের একটি প্রবন্ধে লেখা হয়--'চূড়ামণি মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় তাহেরপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখর রায় বাহাদুর. উত্তরপাড়ার স্বর্গীয় রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ধার্মিকগণ 'ধর্মমণ্ডল' প্রতিষ্ঠা করেন।' বামাচরণ ন্যায়াচার্য চূড়ামণি মহাশয়ের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে লিখেছেন---'ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতির জন্য যে লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া গিয়াছেন, শুনিয়াছি তাহার মূলে চূড়ামণি মহাশয়ের চেষ্টা ছিল।' ৩৮তম বর্ষ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনে পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের ভাষণের একটি অংশ এখানে উদ্ধার-যোগ্য 'বর্তমান মহাসম্মিলনের সভাপতি—রাজা* বাহাদুর পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি, স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয়, স্বর্গীয় প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে আমাদিগের একটি আন্তরিক মিলনসূত্র ঘটে, অপচীয়মান বর্ণাশ্রমধর্মের সংরক্ষণ ব্যতীত যে এই কুশিক্ষাবিভ্রান্ত মরণোন্মুখ জাতির জীবন রক্ষার উপায় নাই—এই চিন্তাই আমাদের আন্তরিক মিলনসূত্র।'

লক্ষণীয় যে, ভূদেবের মৃত্যুর পরে 'ব্রাহ্মণ সমাজ' পত্রিকার পণ্ডিতমণ্ডলী ভূদেবের 'বামনাই' (গোঁড়া ব্রাহ্মণ সংস্কার) সম্বন্ধে যত কথা বলেছেন, তিন খণ্ড 'ভূদেব চরিতে' সংকলিত তথ্যাবলীর মধ্যে তার অর্ধেকও স্থান পায় নি। যে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ভূদেবেরই প্রত্যক্ষ শিষ্য, তিনিও ভূদেবের উদার

*—বর্ধমান রাজ

ভারতচিন্তা তথা সমাজচিন্তার তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি। তাই 'ভূদেবের ভুল' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—'কোনও বড লেখকের ভ্রান্তি ঘটিলে তাহা অপরেও সংক্রামিত হইয়া থাকে। ভূদেববাবুর মুসলমান বিষয়ক ভুল কবিভূষণ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুতেও দেখিতে পাই।' এরপর 'শিবাজী' কাব্য থেকে জাতি-জাতিদ্বেষে কল্যাণের জন্য বিশ্বদেবতা মুসলমানদের এ দেশে পাঠালেন এরকম একটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন।

সামাজিক প্রবন্ধের অন্তর্গত 'ভারতে মুসলমান' বা 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' পড়লেই মুসলমান ভারতবাসী বিষয়ে তাঁর ধারণার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। আসলে একেশ্বরবাদী ইসলামের সঙ্গে ভূদেবের সর্বেশ্বরবাদের বিশেষ পার্থক্য নেই। তাঁর রচিত 'কল্‌মাটি' এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে।

কলমা

এক এবা দ্বিতীয়োঽস্মি স্বর্নামানিবহুনিমে।
ত্রিভীরূপৈ বিশেষেণ মাং জানন্তি বিপশ্চিতঃ
ধর্মোৎসাহ জ্ঞানরূপ ক্রিয়েচ্ছামতিশক্তিধৃক।
নিক্রীড়তি মহাকালো ভূর্ভুবঃ স্বর্গমাশ্রিতঃ
চরাচরমিদং সর্বং যৎসৃষ্টং কর্মণা ময়া।
তস্মাৎ কর্ম ভজেন্নিত্যং জ্ঞানোৎসাহ সমন্বিতঃ।

উদ্ধৃত অনুষ্টুপ 'কলমা'র সঙ্গে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এবং 'উপো ইবে হ্যাগ' মিলিয়ে পড়া যায়। মনে রাখতে হবে, ভূদেব যেমন হরিনারায়ণ সার্বভৌম ও বিশ্বনাথ তর্কভূষণের ঐতিহ্যে লালিত, তেমনি লেকির 'হিস্‌ট্রি অফ র‍্যাশান-লিজম্ ইন ইউরোপ' গ্রন্থের প্রভাবও অল্প নয়। তিনি বেকন ভালোভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। সামাজিক প্রবন্ধের কোন কোন প্রস্তাবে এবং সিদ্ধান্ত-শৈলীতে মেথড অফ ইনডাকশন বেকন-প্রভাব স্পষ্ট। সুতরাং ভূদেবকে কোনমতেই গোঁড়া রক্ষণশীল বলা যায় না।

তবে পারিবারিক ও সামাজিক প্রবন্ধে যে ভূদেবকে পাই, আচার প্রবন্ধের রচয়িতা তার থেকে ভিন্ন। তাঁর পরিকল্পিত 'দার্শনিক প্রবন্ধ' ও 'শিষ্টাচার প্রবন্ধ' বা 'কারুকার্য ও শিল্প সম্বন্ধীয় ইতিহাস' রচিত হলে ভূদেব-মনীষার হয়ত নতুন দিক উদ্‌ঘাটিত হত।* আচার ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে বাঁধ দিতে গিয়েই হয়ত

*'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় ভাগে সংকলিত 'মিশরীয় হর্ম্যপ্রণালী,' 'গ্রীক হর্ম্য-প্রণালী,' 'চীনীয় হর্ম্যপ্রণালী,' 'গথিক হর্ম্যপ্রণালী,' 'মুসলমানীয় হর্ম্যপ্রণালী'

'আচার প্রবন্ধ' লিখেছিলেন। এই প্রাচীন সংস্কারমুখী ঝোঁক ব্রাহ্ম রাজনারায়ণকেও শেষ বয়সে পেয়ে বসেছিল। 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থটি তার প্রমাণ।

যদিও ভূদেবের মতে—'তখনও লেখকের ইংরাজী কলেজের সকল বিষ নামে নাই।' কিন্তু তিনি, মহেশচন্দ্র ঘোষ এবং রাজনারায়ণ তিনজনেই একসঙ্গে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পিতৃভূমি কনৌজ দেখতে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর কল্পনাচক্ষে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পঞ্চ কায়স্থের সাড়ম্বরে বঙ্গ অভিমুখে যাত্রার ছবিটিও ফুটে উঠেছিল। 'ভূদেবচরিত' দ্বিতীয় খণ্ডে আছে—'রাজনারায়ণের আচার-আচরণে এবং শাস্ত্রজ্ঞান বিষয়ে খুশী হয়ে ভূদেব তাঁকে উপবীত দিতে সম্মত হয়েছিলেন।' (অবশ্য পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ভূদেবের পুত্রদের এই বিবৃতিতে সংশয় প্রকাশ করেছেন।) বস্তুতঃ হিন্দুমেলার উদ্যোক্তা মনোমোহন বসুর চিন্তাধারার সঙ্গে যেমন ভূদেবের চিন্তাধারার স্বভাবতই মিল ছিল, তেমনি রাজনারায়ণের দেওঘর-পর্যায়ের ভাবনার সঙ্গেও তার পার্থক্য খুবই কম। 'সামাজিক প্রবন্ধ' সম্বন্ধে রাজনারায়ণের ধারণা এখানে উদ্ধৃত হতে পারে। 'ইহা (সামাজিক প্রবন্ধ) ভারতবর্ষের আধুনিক সকল লেখকের অবশ্য পাঠ্য। ইহাতে ভারতের সকল জটিল সমস্যার বিচার আছে। ইহা আস্তিক্য দেশভক্তি এবং সম্মিলনের ও উদ্যমের মহামন্ত্রস্বরূপ।'

তুলনামূলক ইতিহাসের ভিত্তিতে ভূদেব বিশেষ দেশের সমাজতত্ত্ব-আলোচনার পক্ষপাতী। তাঁর ধারণা অন্যথা ভ্রান্ত সাদৃশ্যবশে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌছনোর আশংকা থাকে। তাঁর অভিমত আজও উপেক্ষনীয় নয়।

হয়ত প্রস্তাবিত 'কারুকার্য ও শিল্প সম্বন্ধীয়' ইতিহাসেরই অংশ। 'শিষ্টাচার' বিষয়ে 'পারিবারিক' ও 'আচার' প্রবন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া বিবিধ প্রবন্ধের (দ্বিতীয়ভাগ) 'হিন্দু সমাজে খাওয়া-দাওয়া' 'হিন্দুসমাজে ধর্মনীতি,' 'ঈর্ষ্যাপ্রবণতা,' 'লক্ষ্মীছাড়া দশা' বিশেষ উল্লেখ্য রচনা। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত 'পুরাবৃত্তের কথা' (উনিশটি পরিচ্ছেদ) এবং 'সমাজের কথা' (তিরিশটি পরিচ্ছেদ) পারিবারিক ও সামাজিক প্রবন্ধের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া উচিত। তাহলেই ভূদেব-মানসের পূর্ণ-পরিণত রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি যে বাঙালী সমাজ, ভারতীয় সমাজ এবং বৃহত্তর মানব সমাজ সম্বন্ধেই গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন—কোন বিশেষ সমাজবিদ বা ঐতিহাসিকের পথে অন্ধ পরিক্রমায় নয়—তার সমগ্র পরিচয় আমাদের বিস্মিত করে।

'ইউরোপের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষীয় সমাজের উপাদান যেমন ভিন্ন প্রকৃতিক, ঐ উপাদানগুলির উপর্যুপরি বিনিবেশও তেমনি ভিন্নরূপ। নব্য ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যগুলি এক রোম সাম্রাজ্যের সুপ্রশস্ত ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত। নব্য ইউরোপীয়দিগের পূর্বপুরুষেরা আপনাদের কর্তৃক বিজিত রোমীয়দিগের স্থানে শিক্ষাগ্রহণ করে, এবং রোমের ধর্মশাস্ত্র, রোমের ব্যবস্থাশাস্ত্র এবং রোমের সাহিত্য-শিল্পাদি প্রাপ্ত হইয়া সভ্য হইতে আরম্ভ করে। ভারতবর্ষে ওরূপ কোন সুসভ্য সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য বিজয় করিয়া আর্য পুরুষেরা এখানে বাস করেন নাই। তাঁহারা নানা ভাষাভাষী, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দস্যু দৈত্যাদির দলকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগের শাসন, পালন এবং শিক্ষা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব ইউরোপীয় রাজ্যগুলির তলভাগের স্তরে একতা এবং সভ্যতার নিবেশ, উপরের স্তরে অনৈক্য এবং বর্বরতার স্থান, ভারতবর্ষের তলভাগে অনৈক্য এবং বর্বরতা, উপরিস্তরে জ্ঞান এবং সভ্যতার আশ্রয়। এই মৌলিক পার্থক্য হইতে অনেক বিষয়ের অনেক পার্থক্য জন্মিয়াছে এবং সেইগুলির বিশেষ বিচার না করিয়া যাহারা ইউরোপীয় ইতিহাস হইতে সূত্র সংকলন পূর্বক ভারতবর্ষীয় সমাজতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করেন তাঁহারা সুবহু স্থলেই অকৃতকার্য হইয়া থাকেন।'

১। রুশো—ফরাসী দার্শনিক। পুরো নাম জাঁ জেকস্ রুশো (১৭১২-১৭৭৮)। বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী এই চিন্তাবিদ একাধারে দার্শনিক, সমাজ বিজ্ঞানী এবং ঔপন্যাসিক। রুশোর 'লা কনট্র্যাক্ট সোশাল' ১৭৬২ সালে প্রকাশিত হয়।

২। হবস, টমাস—ইংরেজ দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী (১৫৮৮-১৬৭৯)। 'লেভিয়াথান' (১৬৫১) বিখ্যাত রচনা।

৩। লক, জন—(১৬৩২-১৭০৪)। বিখ্যাত রচনা 'এ্যান এসে কনসারনিং হিউম্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং' (১৬৯০)।

৪। হিউম, ডেভিড—(১৭১১-১৭৭৬) ইংরেজ দার্শনিক ও সমাজ-বিজ্ঞানী। বিখ্যাত রচনা 'এ ট্রিটিজ অফ হিউম্যান নেচার' (১৭৩৯-৪০) এবং ছ খণ্ডে বিস্তৃত ইংলণ্ডের ইতিহাস (১৭৫৪-১৭৬১)।

৫। সেণ্ট সাইমন (১৭৬০-১৮২৫)। ফরাসী দার্শনিক। কোঁত প্রমুখ ধ্রুববাদী ও হিতবাদী সমাজ বিজ্ঞানীদের গুরুস্থানীয়।

৬। 'ধ্রুববাদ'—ফরাসী দার্শনিক কোঁতের (১৭৯৮-১৮৫৭) 'পজিটিভিজম্'।

কোঁতের রচনাবলী—'এ প্ল্যান ফর দি সায়ানটিফিক ওয়ার্কস্ নেশেসারি টু রি-অরগানাইজ সোসাইটি' (১৮২২), কোর্স অফ পজিটিভ ফিলজফি (১৮৩০-১৮৪২) 'সিসটেম অফ পজিটিভ পলিটি' (১৮৫১-১৮৫৪) 'পজিটিভিস্ট ক্যালেণ্ডার' (১৮৪৯) 'পজিটিভিস্ট লাইব্রেরী' (১৮৫২) 'সিসটেম অফ পজিটিভ লজিক' (১৮৫৬) প্রভৃতি। জ্ঞানাংকুর সম্পাদক পজিটিভিজমের অনুবাদ করেন 'প্রত্যক্ষধর্ম।' উনিশ শতকের বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই কোঁতের ধ্রুববাদ বা প্রত্যক্ষ ধর্মের দ্বারা কম-বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য জিরাল্ডিন হ্যানকব ফরবেসের 'পজিটিভিজম ইন বেঙ্গল' (১৯৭৫), ডঃ প্রদীপ সিংহের 'বেঙ্গল ভিক্টোরিয়ানস্' এবং এরিক স্টোকসের 'ইউটিলিটারিয়ানিজম এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া।'

৭। রেভারেণ্ড জেমস লঙ্ (১৮১৪-১৮৮৭) বিখ্যাত ভারতহিতৈষী পাদ্রী। তাঁর 'ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ,' 'গ্রামার,' প্রবাদ সংগ্রহ, নীলদর্পনের ইংরেজী অনুবাদ সম্প্রচার এবং নীল-রায়তদের পক্ষে কারাবাস—রবীন্দ্রনাথ কথিত 'বড়ো ইংরেজ'-এরই পরিচয় দেয়। দ্রঃ যোগেশ বাগল প্রণীত 'বেথুন সোসাইটি গ্রন্থ,' এবং সেণ্ট পলস কলেজ শতবার্ষিকী গ্রন্থ।

৮। কোঁতের চিন্তাধারায় সমকালের ফ্রান্সের ইতিহাসের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আছে। তিনি মুখ্যতঃ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ইতিহাসকেই ভিত্তি করেছিলেন। গ্রীক-রোমীয় ক্ল্যাসিকাল ঐতিহ্যও তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

সেখানেই ভূদেবের আপত্তি। ভারতবর্ষ একটি প্রাচীন দেশ। তার ঐতিহ্য ও ইতিহাস কোঁতের আলোচনার বহির্ভূত। তাই দেখা যায়, কোঁতের 'পজিটিভিস্ট ক্যালেণ্ডারে' ভারতবর্ষের আর কারো নাম নেই, কেবল মনু ও বুদ্ধের নামে দুটি দিন চিহ্নিত আছে। পজিটিভিস্টদের আদর্শ গ্রন্থতালিকায় কোন ভারতীয় সাহিত্য বা দর্শনগ্রন্থ স্থান পায় নি। ভূদেবও ইতিহাস-ভিত্তিক সামাজিক আলোচনায় বিশ্বাসী। কিন্তু পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গিতে।

> 'জাতিভেদে সর্বপ্রকার সাহিত্য রচনার রীতি ভিন্ন হয়। ইতিবৃত্ত প্রণয়নের প্রণালীও স্বতন্ত্র হয়।
>
> ইউরোপীয়েরা ইতিহাস বলিতে গ্রীকদিগের এবং তদনুকারী রোমীয়দিগের ইতিহাসই বুঝেন।
>
> নব্য ইউরোপীয় জাতিদিগের ইতিহাসগ্রন্থ সকল গ্রীক এবং রোমীয়দিগের হইতেই অনুকরণ দ্বারা প্রাপ্ত।
>
> আমাদের জাতীয় প্রকৃতির সম্পূর্ণ অন্যরূপ ইতিহাস আছে।'
>
> জাতীয়ভাব্। সামাজিক প্রবন্ধ

৯। ফরবেস, পজিটিভিজম ইন বেঙ্গল, পৃ-৩

১০। *The Bengalis continued to be influenced by western values and ideologies but there was a shift in the focus of their criticism whieh began to be levelled against the British Government, the operation of British Justice and the methods of British industrial & commercial enterprises'. This disenchantment was closely related to the growing pride in the Hindu past and lack of oppcrtunities for the educated class.*

১১। 'তিনি ইংরেজী সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছিলেন, সেই সাহিত্য তাঁহাকে জাতীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের রত্নরাশির সৌন্দর্য পরিগ্রহে সামর্থ্য দিয়াছিল, তিনি ইংরেজী দর্শনশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই শাস্ত্র তাঁহাকে জাতীয় দর্শনশাস্ত্রের বিশ্ববিমোহিনী শক্তির পরিজ্ঞানের অধিকারী করিয়াছিল, তিনি ইংরেজী ইতিহাস পাঠে মনোযোগী হইয়াছিলেন, সেই ইতিহাস তাঁহাকে জাতীয় ইতিহাসের মহত্ত্ব রক্ষায় নিয়োজিত রাখিয়াছিল।

রজনীকান্ত গুপ্ত। প্রতিভা। পৃ-৬৫

১২। 'যে ব্যক্তি আমাদের জাতির প্রধান গৌরবস্থল, যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আমরা জগতের সমক্ষে স্পর্ধা করিতে পারি, নিতান্ত পরিতাপের বিষয় তাহার সম্মানার্থে আমাদের অনেকে উপস্থিত হন নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজ তাঁহার একটি অক্ষয় ও অনন্ত কীর্তিস্তম্ভ। রাজা রামমোহন রায়ের পবিত্র জীবন কেবল পবিত্র কার্য সম্পাদনার্থেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।'

ভূদেব মুখোপাধ্যায়। বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ, পৃ-১৫

১৩। *We cannot describe the great change better than by stating that English conquest and English education may be supposed to have removed Bengal from the moral atmosphere of Asia. to that of Europe.*

The independence of America, the French revolution, the war of Italian independence, the teachings of history, the vigour and freedom of English literature and English thought, the great effort of the French intellect of the 18th Century, the results of German labour in the field of Philo-

logy and ancient history, Positivism, Utilitarianism, Darwinism--all these influenced and shaped the intellect of modern Bengal.

R. C. Dutt, Literature of Bengal.

১৪। ভারতের সব ভাষাই সংস্কৃত থেকে জাত—এই মতটি অভ্রান্ত নয়। তামিল, তেলুগু, সংস্কৃত-গোষ্ঠীর ভাষা নয়, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর। অবশ্য উনিশ শতকের অনেক ভারতীয় মনীষীর রচনায় এই ধারণাটি গৃহীত হয়েছে।

১৫। 'সমস্ত ভারতবর্ষের রাজ্যশাসন এক্ষণে সর্বতোভাবে এক হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের ঈশ্বরী এখন ভারতেশ্বরী হওয়াতে আমরা সকল ভারতবর্ষীয় এক সম্রাটের অধীনে এক মহাসাম্রাজ্যবাসী বলিয়া আপনাদিগকে সুস্পষ্টরূপে জানিতেছি। এক্ষণে আমাদের সাধারণ সুখ দুঃখ আশা ভরসা আকাংক্ষা এবং নিরাশা একসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে পূর্বে এতদূর না হউক, কখন কখন ভারতবর্ষের অতি সুবিস্তৃত ভূমিভাগসকল একচ্ছত্রের অধীন হইত—মান্ধাতা, শ্রীরামচন্দ্র, যযাতি, যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, অশোক প্রভৃতি আর্য নরপালগণ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন—আর আকবর শাহ প্রভৃতি কয়েকজন মুসলমান সম্রাটও ভারতভূমির অনেকানেক প্রদেশ আপনাদিগের করতলস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন।'

জাতীয়ভাব। সামাজিক প্রবন্ধ

ভূদেবের মতে, এই প্রশাসনিক ঐক্য 'ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাগের পরস্পর সম্মিলনোপায়' অতীতে যেমন হয়েছিল, ইংরাজ শাসনকালেও তেমনি হবে।

১৬। 'আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকদিগের হৃদয়ে মুসলমান জাতি এবং মুসলমান ধর্মের প্রতি যতটা বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে, পূর্বকালের পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত, সদাচার-সম্পন্ন সদ্‌ব্রাহ্মণদিগেরও মনে তাহার অর্ধাংশ দেখা যাইত না।' জাতীয়ভাব—ভারতে মুসলমান। সামাজিক প্রবন্ধ

১৭। ভারতবর্ষে ইংরাজের প্রতাপ দোর্দণ্ড, তাঁহার শাসনরীতি দৃঢ়-শৃংখলাবদ্ধ, তাঁহার কার্যপ্রণালীতে হঠকারিতা, পক্ষপাতিতাদি দোষ নাই বলিলেও চলে, অথবা যাহা কিছু আছে, তাহা বিশেষ যত্নসহকারে সমাচ্ছাদিত। ইংরাজের রাজত্বে বহির্বাণিজ্যের বিস্তৃতি হইতেছে, অন্তর্বাণিজ্যের সৌকর্য বাড়িতেছে, বিচারকার্যে ন্যায়পরতা রক্ষিত হইতেছে।

ইংরাজাধিকার—ইংরাজের রাজভাব। সামাজিক প্রবন্ধ

১৮। অর্থাৎ শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল। তিনি প্রাচীন আর্যশাস্ত্রের গুণগান করতে গিয়ে কখনো যুক্তিপন্থা বর্জন করেননি। বরং 'ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে' ব্যথিত হয়েছেন। সমুদ্রযাত্রা, বৃত্তিভেদে জাতিভেদ সত্ত্বেও বৃত্তি-বদল, সমবায়-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মত আধুনিক কালেরই উপযোগী। 'যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানি প্রজায়তে'—উদ্ধৃত হয়েছে।

Although there were different varieties of Hindu revivalism, the movement was characterized by a new pride in Hinduism. It was declared the greatest of all religions and capable of solving the problems of the East and the West.

ফরবেস। প্রাগুক্ত গ্রন্থ। পৃ-১২৫

১৯। লর্ড ওয়েলেসলির একটি বাক্য অনুবাদ করে ভূদেব মন্তব্য করেছেন, 'ইংরাজ ইংলণ্ডকেই মনের সহিত ভালবাসেন এবং পৃথিবীর অপর সকল দেশকে নিতান্ত হেয় জ্ঞান করেন।'

'ভারতে ইংরাজাধিকার—বৈদেশিকভাব' পরিচ্ছেদের উপসংহারে দশটি অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। সংক্ষেপে—ইংরেজের মনোভাব, 'তুমি ইংরাজ নহ। তুমি আমার ধর্ম, আমার আচার, আমার ব্যবহার, আমার ভাষা, আমার পরিচ্ছদাদির অনুকরণ করিতে চাও কর, কিন্তু কখনই সমান হইতে পারিবে না। কারণ আমিই ইংরাজ, তুমি ইংরাজ নহ।'

২০। 'জাপানীয়েরা ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং শিল্প শিখিতেছে। বর্ষে বর্ষে তাহাদের শতাধিক সংখ্যক লোক ইউরোপের নানা দেশে এবং আমেরিকায় গিয়া ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষা করে এবং স্বদেশে আসিয়া স্বাধীনভাবে কলকারখানা চালায়। ইহারই মধ্যে উহারা দুই তিনটি ইউরোপীয় কলের সংস্কার এবং উৎকর্ষ সাধন করিয়া তুলিয়াছে। আমরা যখন জাপানীয়দিগের ন্যায় ইউরোপে গিয়া শিল্প-বিজ্ঞান শিখিয়া আসিতে পারিব, তখনই আমাদিগের মধ্যে দেশ-হিতকর বৈজ্ঞানিকতার সঞ্চার আরম্ভ হইবে।'

পাশ্চাত্ত্যভাব-বৈজ্ঞানিকতা। সামাজিক প্রবন্ধ

'It was the British intruder who broke up the Indian hand-loom and destroyed the spinning wheel. England began with driving the Indian Cottons out from the European market; it then introduced twist into Hindustan and in the end inundated

the very mother-country of Cotton. ···British steam and science uprooted, over the whole surface of Hindustan, the union between agriculture and manufacturing indnstry.

K.Marx. The British Rule in India. 1853.

২২। খ্রীষ্টিয় মতে দীক্ষাদানের জন্য পাদরি ডঃ উইলিয়ম কেরি ভারতবাসীকে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে বিরূপ করে তুলতে পারেন—এই আশংকায় ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসন কেরিকে তাঁদের এলাকা থেকে বহিষ্কার করেন। সেকালের ওলন্দাজ এলাকা শ্রীরামপুরে তখন তিনি আশ্রয় নেন।

২৩। *England, it is true, in causing a social revolution in Hindustan was actuated only by the vilest interests, and was stupid in her manner of enforcing them. But that is not the question. The question is can mankind fulfil its destiny without a fundamental revolution in the social state of Asia ?*

If not, whatever may have been the crimes of England, she was the unconscious tool of history in bringing about that revolution. K. Marx. The British Rule in India, 1853.

২৪। আহার্য ও শারীরিক সামর্থ্য নিয়ে উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবী মহলে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছিল। বেথুন সোসাইটিতে এইচ· এল· পি· ওয়াইন একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন '*Bodily Training—its effect on National character*'। (১২ই মার্চ, ১৮৬৮) তার প্রতিক্রিয়া প্রথমেই দেখা যায় ভূদেব-জামাতা তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গোন্নয়ন' (ছটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত) রচনায়। এর আগে অক্ষয়কুমার দত্ত নিরামিষ ভোজনের পক্ষে লেখনী ধরে গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছেন। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ আহার্য বিষয়ে সবরকম গোঁড়ামির বিপক্ষে ছিলেন। দ্রঃ 'বঙ্গদর্শন ও বাংলা সাহিত্য'—তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অধ্যায়।

২৫। 'ইংরাজের এই কৌশলটি যে অপরিণামদর্শিতার ফল তাহা নিঃসন্দেহ, কারণ যদিও রোমীয়দিগের ঐরূপ রাজনীতি থাকা সত্য হয়, তথাপি সে রাজনীতির বলে রোম সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হয় নাই।· অতএব এই রাজনীতি সর্বতোভাবে তুচ্ছ।' জাতীয়ভাব—ভারতবর্ষে মুসলমান। সামাজিক প্রবন্ধ

২৬। 'শ্রমবিভাগের গুণে ভোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়া উঠে, এবং সেই

জন্য সমাজের কতকলোক দৈহিক পরিশ্রমের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া জ্ঞান-চর্চায় নিযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু গতানুগতিকতা ও অর্থলোভ, আর বিভিন্ন সমাজের পরস্পর প্রতিযোগিতা নিবন্ধন শ্রমবিভাগের শুভময় ফল যে দৈহিক পরিশ্রমের লাঘব তাহা শ্রমজীবীদিগের ভাগ্যে কিছুই ঘটে না।'

পাশ্চাত্ত্যভাব—উন্নতিশীলতা। সামাজিক প্রবন্ধ

২৭। পাশ্চাত্ত্যভাব-স্বাতন্ত্রিকতা (সামাজিক প্রবন্ধ) দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রনাথের আত্মশক্তি ও সমূহ, স্বদেশী সমাজ প্রভৃতি প্রবন্ধাবলীতেও অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

সাহিত্য চিন্তা

বঙ্কিম ভূদেব রাজনারায়ণ তিনজনেই পাশ্চাত্ত্যবিদ্যায় সুশিক্ষিত। বঙ্কিম (জ. ১৮৩৪) হুগলী মহসীন কলেজের এবং ভূদেব (জ. ১৮২৫), রাজনারায়ণ (জ. ১৮২৬) হিন্দু কলেজের ছাত্র, সতীর্থ। অথচ তিনজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে কী গভীর পার্থক্য। ভূদেব বয়সে বঙ্কিমের চেয়ে দশ বছরের বড়, কিন্তু তাঁর অনেক রচনা বঙ্কিমের কোন-কোন রচনার পরবর্তী। যেমন উত্তর রামচরিত পর্যালোচনা। রাজনারায়ণ বাংলায় সাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধ বেশি লেখেননি। তবু তাঁর সাহিত্যিক মতামত সেকালে অনেকের কাছে চূড়ান্ত বিচার বলেই গণ্য হত। বন্ধুবর মধুসূদন দত্ত (জ. ১৮২৪) নতুন রচনা পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই রাজনারায়ণকে পাঠাতেন, তাঁর মতামত অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে পরিমার্জনাও করেছেন। বস্তুতঃ মধুসূদনের পত্রাবলীতে ব্যক্ত তাঁর সাহিত্য চিন্তার অধিকাংশই রাজনারায়ণকে সম্বোধন করে লিখিত।

আলোচ্য তিনজন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত মনীষীর চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বঙ্কিম রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সাহিত্য সমালোচনা করেছেন। 'সৌন্দর্য সৃষ্টিই' তাঁর কাছে 'কাব্যের মুখ্য লক্ষ্য।' অবশ্য ইংরেজ রোমান্টিক কবি ও সমালোচক-দের মতো বঙ্কিমেরও সাহিত্যভাবনায় সমাজ সংস্কার বা নীতিশিক্ষা বিশেষ মর্যাদা পেয়েছিল। সুতরাং কিছুটা স্ববিরোধ রয়ে গেছে। তবে সৌন্দর্যসৃষ্টি ও সমাজহিতের মধ্যে প্রথমটির দিকেই পাল্লা ভারি। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ক্ল্যাসিক্যাল সমালোচনার আদর্শ অনুসারী। তাই তাঁকেই মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য ধারায় সমালোচনা-সাহিত্য রচনার অনুরোধ করেন।

'I wish you would take up the subject of criticism. Aristotle, Longinus, Quintilian, the sahitya—Darpan, Burke, Kanee, Addison, Dryden, and a host of others, not forgetting old Blair's lectures or the German schlegel'.

রাজনারায়ণের 'বিবিধ প্রবন্ধ' তাঁর সমালোচনা শক্তির নিদর্শন। ভূদেব ও রাজনারায়ণ দুজনেই মধুসূদনের প্রিয় হলেও সাহিত্য ভাবনায় দুজন ভিন্ন কোটির মানুষ। ভূদেব পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা রীতির দ্বারা আকৃষ্ট হন নি। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রও তাঁকে টানে নি। কারণ নিজের লক্ষ্য বিষয়ে ভূদেব কখনো দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না। পারিবারিক প্রবন্ধ-আচার প্রবন্ধের লেখক ভূদেবের পক্ষে 'সাহিত্যের জন্য সাহিত্য' পন্থায় বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব ছিল না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সংঘর্ষের বেগ ধারণ করে তাকে প্রাচ্যমুখী খাতে প্রবাহিত করানোর ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবন ও সারস্বত কর্ম সেই ব্রত-সাধনায় নিয়োজিত ছিল। সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের বিশ্লেষণ এবং রসাস্বাদনেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাই তিনি বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমের সঙ্গেও একমত হতে পারেন নি। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় নীতিশিক্ষার কথা একবারও উত্থাপন করেন নি, বঙ্কিম নীতি-শিক্ষাকে মর্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু সৌন্দর্য সৃষ্টিকেই সাহিত্যের ('কাব্যের') মুখ্য উদ্দেশ্য বলেছেন। ভূদেব নীতিশিক্ষার ক্রমবিকাশ ও কাব্য-নাট্যকাদির কলাকৌশলকে অভিন্নসূত্রে গ্রথিত করে দেখেছেন। অর্থাৎ নীতিপ্রেরণা ও সৌন্দর্য 'অপৃথগ্‌যত্ননির্বত্য'। এই দৃষ্টি বিশুদ্ধ শিল্পদৃষ্টি না হলেও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্বীকৃত শিল্প-প্রস্থান।

অবশ্য একথা মনে করার কারণ নেই যে, নীতিবোধের তাড়নায় তাঁর রসাস্বাদ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, হিন্দু-ব্রাহ্ম সম্পর্ক এবং পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ে ভূদেবের যে উদারতা, যে প্রাগ্রসর মনোভাবের পরিচয় মেলে, সাহিত্য সমালোচনাতেও তার অভাব ঘটেনি।

এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত তিনটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ছাড়াও পুস্তক সমালোচনা সূত্রে যে সব প্রাসঙ্গিক মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে, তার মধ্যেও ভূদেবের মনীষার দীপ্তি এবং রসবোধের সমন্বয় হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হতে পারে।

ক. বাংলা ভাষা ও বিষয়ক প্রস্তাব

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের এই পুস্তিকাটিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিধিবদ্ধ ইতিহাস। যেহেতু প্রথম ইতিহাস, যেহেতু প্রথম সংস্করণ নানা কারণে অসম্পূর্ণ

হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত তিনি যে পরিমাণে প্রাচ্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত, সে-পরিমাণে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। অথচ মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সেকালের নবীন লেখকেরা সকলেই ছিলেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় অভিস্নাত। মিলটন, টমাস মুর, বায়রণ, ওয়াল্টার স্কট প্রমুখের সাহিত্য-অনুশীলনের পটভূমিতেই উনিশ শতকের নবীন বাংলা সাহিত্যের যথার্থ বিচার করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, রামগতি এই পটভূমির তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি। সেখানেই তাঁর মূল্যায়নে কিছু বিচার বিভ্রম ঘটেছে। অবশ্য এটাও লক্ষণীয় যে, পরবর্তী সংস্করণে রামগতি অনেক পরিমাণে পরিমার্জনা করেছিলেন।

ভূদেব প্রথম সংস্করণের বইটি এডুকেশন গেজেটে সমালোচনা করেন। তিনি আধুনিক যুগ সম্বন্ধে রামগতির মন্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তার কারণ সমালোচকের অনুপ্রবেশ-শক্তির দৈন্য। খুব সংযত ভাষায় অপ্রিয় সত্যকে ভূদেব 'প্রিয়' করে বলেছেন। প্রথমেই প্রশংসাবাচন—'ন্যায়রত্ন মহাশয় গ্রন্থ সমালোচনায় জানিয়া শুনিয়া কাহার প্রতি অত্যাচার করেন নাই।' তবু যেখানেই প্রসঙ্গচ্যুতি, বিচারে বিভ্রম, সেখানেই ভূদেব যুক্তিসম্মত প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তবে লেখকের সঙ্গে সমালোচকের মতান্তর চরমে পৌচেছে মধুসূদন প্রসঙ্গে। সেকালের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই মেঘনাদ বধের অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৌন্দর্যরহস্য বুঝতে পারেন নি। বঙ্গদর্শনের একজন বিশিষ্ট লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার অমিত্রাক্ষর বলতে বুঝেছিলেন, 'মিলহীন পংক্তি।' তাঁর দৃষ্টান্ত: 'কান্‌ছেন রাঘববাঞ্ছা গামছা আনছে কেটা।' বস্তুত হেমচন্দ্রের অমিত্রছন্দও 'মিলহীন' ডগেরেল। এমন কি বঙ্কিমের কাছেও বৃত্রসংহারের ছন্দোবৈচিত্র্য মেঘনাদ বধের অমিত্র ছন্দের চেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। সুতরাং রামগতির বিচার বিভ্রমকেও ঐতিহাসিক পটে দেখা যায়।

ভূদেবের সমালোচনা যথার্থ, দূরদর্শী এবং সুরুচিসম্মত। তাঁর মতে মধুসূদনের দোষ দেখাতে গিয়ে জগবন্ধু ভদ্রের ছুছুন্দরী বধ কাব্যের দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া খুবই অসমীচীন হয়েছে। প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন, কাব্যবিচারে মতভেদ থাকতে পারে। বিশেষত পাণ্ডিত্য রস-প্রমাণের সহায়ক হয় না। 'সুপ্রসিদ্ধনামা ডাক্তার জনসন মহাকবি মিণ্টনের কবিত্বশক্তি অনুভব করিতে পারেন নাই। কথিত আছে মহামহোপাধ্যায় মম্মট ভট্টও নৈষধ চরিত মহাকাব্যে কেবল দোষালংকারের স্থলই দেখিয়াছিলেন। জনসন এবং মম্মট ভট্টের ন্যায় আমাদিগের ন্যায়রত্ন মহাশয়েরও কেহ বা মিলটন, কেহ বা শ্রীহর্ষ

থাকিতে পারেন। জনসন মিলটনকে ছাড়িয়া পোপকে সর্বপ্রধান কবি বলিয়া ধরিয়াছিলেন, ন্যায়রত্ন মহাশয়েরও তেমনি কেহ একজন পোপ থাকিতে পারেন।'

ভূদেবের বক্তব্য সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১। রামগতি জেনে শুনে কারো প্রতি অবিচার করেন নি। অর্থাৎ তিনি বিদ্বিষ্ট সমালোচক নন। সে ত্রুটি আরো মারাত্মক হত।

২। রামগতির ত্রুটি অজ্ঞতাপ্রসূত। সমালোচকের অজ্ঞতা যে বিচারের মাত্রাজ্ঞান ক্ষুণ্ণ করে, সে বিষয়ে তিনি অনবহিত ছিলেন। তবে এ-রকম অনবধান-জনিত বিচার বিভ্রমের দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ইতিহাসে অপ্রতুল নয়।

৩। বিচারে বিভ্রান্তির পেছনেও একটা কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। ভুল জায়গা থেকে তাঁরা যাত্রা শুরু করেন। কোন লেখকের রচনাকে আদর্শ ধরে নিয়ে তাঁরা অন্যের বিচার করেন। সেখানেই বিভ্রমের উৎস। প্রমাণ জনসন, মম্মট ভট্ট।

৪। বাংলা ভাষায় প্রকৃত সমালোচনার অভাব। ভূদেবের উপসংহার অনুচ্ছেদটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সমালোচকের সৌন্দর্যবোধ, সমালোচ্য গ্রন্থ 'কোন বৃক্ষ কোন্ বীজ হইতে উৎপন্ন' তার বিচার এবং সে বিচারের অভাবে 'পল্লব গ্রাহিতা' সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা একালের বিচারেও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক।

খ· মেঘনাদ বধ, বৃত্র সংহার ও অবকাশ রঞ্জিনী

বৃত্রসংহার ও অবকাশরঞ্জিনী যথাক্রমে হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের রচিত। একটি মেঘনাদ বধ অনুগামী আখ্যানকাব্য, অপরটি নানা বিষয়াশ্রয়ী খণ্ড কবিতার সংকলন। নবীনচন্দ্রের কাব্যের নামেই বায়রনের ***'Hours of Idleness'*** গ্রন্থের প্রভাব স্পষ্ট। ভূদেব এই দুই কবির রচনা-স্বাতন্ত্র্য নিখুঁত ভাবেই লক্ষ্য করেছেন। বৃত্রসংহারে মহাকাব্যের উপযোগী বিষয়বৈভব আছে। এ বিষয়ে সেকালের পাঠকদের প্রতি ভূদেবের বক্তব্য :

> 'বৃহৎ কাব্য রচনার উপকরণ আহরণে এত শক্তি আছে পাঠকগণ নূতন দেখিবেন। ক্ষুদ্র কাব্য রচনায় তাঁহার শক্তি যে অদ্বিতীয়, অথবা প্রায় অদ্বিতীয়, তাহা পূর্ব হইতেই প্রসিদ্ধ আছে। 'ভারত সঙ্গীত' ও 'ভারত বিলাপ' নামে যে দুটি প্রস্তাব এই কাগজে* প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার সদৃশ গীতিকাব্য বাংলা ভাষায় রচিত হয় নাই। এ দুয়ের পূর্ব প্রচারিত ও

*'প্রস্তাব' অর্থে কবিতা। এ· গে· ৭ই শ্রাবণ ১২৭৭ এবং ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭।

পশ্চাৎ প্রচারিত অন্য যে সকল ক্ষুদ্র কাব্য, হেমবাবুর হাত হইতে বাহির হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার যশের পূর্ণ পোষকতাই করিয়াছে। এক্ষণে মহাকাব্য রচনায় হেমবাবুর ঈদৃশ কৃতকার্যতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। তবে মাইকেলের একাধিপত্য অপ্রতিহত রহিয়াছে। তথাপি হেমবাবু শত সহস্র ধন্যবাদের যোগ্য। তিনি মাতৃভাষাকে এরূপ অপূর্ব রত্নে ভূষিত করিয়াছেন বলিয়া পাঠক সমাজের চিরকৃতজ্ঞতা লাভ করিবেন।'

এডুকেশন গেজেট। ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫

উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকে রবীন্দ্রপ্রতিভার আত্মপ্রতিষ্ঠার পরেও 'ভারত-সঙ্গীত' ও 'ভারত বিলাপ' কবিতাদুটি বহু লেখনীতে অনুকৃত হয়েছে। ভূদেব সমকালীন বাংলা কবিতায় হেমচন্দ্রের এই প্রভাববিস্তৃতি লক্ষ্য করেছেন। বৃত্রসংহারে প্রমাণিত হয়েছে কবির মহাকায় কাব্য রচনার সাফল্য। ভাবলে অবাক লাগে, বঙ্কিম যখন 'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ' বলে হেমচন্দ্রের কাব্যে অভিভূত এবং মেঘনাদবধ কাব্যের আলোচনায় বিমুখ, তখন ভূদেব সনাতন ধর্মের জয়গান সত্ত্বেও বৃত্রসংহারকে সিদ্ধরস-ব্যতিক্রমী মেঘনাদ বধের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে পারেন নি। বরং বৃত্রসংহারের চরিত্রচিত্র, ঘটনা সংস্থান এবং স্বাদেশিকতায় 'মেঘনাদ বধের অপ্রতিহত প্রভাব' তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। 'অপ্রতিহত প্রভাব' মেনে নিলে বাংলা সাহিত্যে বৃত্রসংহারের আবির্ভাবকে আর 'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ' বলা যায় না। এখানে ভূদেবের ধারণা বঙ্কিমের অতি-প্রশংসা থেকে পৃথক। বঙ্কিম-সুহৃৎ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এ বিষয়ে বঙ্গদর্শনেই আক্ষেপ করেছিলেন: 'মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রকৃত সমালোচনা আজিও হইল না। অথচ এই রূপকপ্রিয় দেশে, কোন লেখক যদি অধুনাতন বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া 'ভগবান মরীচি-মালী'-র সহিত ইহার উপমা দিবার লোভটুকু সংবরণ করিতে পারেন, তবে তাঁহাকে মনে করিতে হইবে যে, মেঘনাদই বঙ্গের 'প্রদীপ্ত প্রভাত তারা।' যিনি বাঙ্গালিকে মেঘনাদবধ কাব্য বুঝাইতে সক্ষম, তিনি বুঝাইলেন না।'* ইঙ্গিতে এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই বলা হয়েছে। তিনি বৃত্রসংহারের কাব্যগুণে অত্যধিক মহত্ত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু ভূদেব হেমচন্দ্রের বিষয়নির্বাচনে মহাকাব্য সম্ভাবনা লক্ষ্য করেও বৃত্রসংহারকে মেঘনাদ বধের ওপরে স্থান দেননি।

নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনীর অনেকগুলি কবিতা বঙ্গদর্শনেই প্রকাশিত

*শ্রীশচন্দ্র মজুমদার/বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮৮

হয়েছিল। তার মধ্যে 'কেন ভালবাসি ?' গীতিকবিতা রূপে উৎকৃষ্ট। এডুকেশন গেজেটে ভূদেব অবকাশরঞ্জিনী দ্বিতীয়ভাগের সমালোচনা করেন (১২ই আশ্বিন, ১২৮৫)। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে গীতিকাব্যের স্বরূপ, নাট্যকাব্যের সঙ্গে তার পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। বৈষ্ণব কবিতা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা এবং নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনীকে তিনি 'উৎকৃষ্ট গীতি-কাব্য' বলেছেন। 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।' কিন্তু অবকাশরঞ্জিনীর বিষয়ব্যাপ্তিকে ভূদেব ভালো চোখে দেখেননি। নবীনচন্দ্রের ভাবের অগভীরতা এবং প্রকাশচাপল্য তিনি ঠিকই ধরেছিলেন। অত্যন্ত সংযত ভাষায় তিনি অপ্রিয় সত্য ব্যক্ত করেছেন। 'এক্ষণে এ দেশের লোকের মনোভাব যেদিকে প্রবল, এ কবির লেখনীর গতিও সেইদিকে প্রসর। ইহার ভাব গভীর, ভাষার লালিত্য তত নহে। ইহার প্রতি নিশ্বাসে স্বদেশহিতৈষণা প্রবাহিত হয়। সে দেশহিতৈষণা এক্ষণকার শিক্ষিত সাধারণের ন্যায় অতি অভিব্যক্ত, অতি বিশাল। কিন্তু অধিক বিস্তৃত হইলে নদী তত গভীর হইতে পারে না, ভূমির অধিক অন্তরে স্থান পায় না।' বলা বাহুল্য, শোভনসুন্দর ভাষায় এখানে কবি নবীনের কবিতায় ভাবের আবেগসংহতির অভাব নির্দেশিত হয়েছে।

গ. হেমলতা ও ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ

হিন্দু স্কুলের শিক্ষক হরলাল রায় সেকালের একজন বিশিষ্ট নাট্যকার। তাঁর হেমলতা, বঙ্গদর্শন, বেঙ্গল ম্যাগাজিন, সাধারণী এবং এডুকেশন গেজেটে সমালোচিত হয়।

ভূদেবের মতে হেমলতা তিনটি কারণে উল্লেখযোগ্য। এক, হেমলতার গঠন। অহেতুক ঘটনাবাহুল্য বা অবান্তর কাহিনী সংযোজন নেই। সংলাপেও মিতবাক। 'নাটকখানি বেশ আঁটা-সাঁটা হইয়াছে।' দুই, 'যদি তাঁহার কবিত্ব-শক্তি অধিক থাকিত তবে এই গ্রন্থখানি অপূর্ব হইত। প্রকৃত কবিত্বশক্তি অধিক না থাকিলেও এ গ্রন্থখানি পাঠোপযোগী হইয়াছে।' 'তিন, ইহা অভিনয়ের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।' এ বিষয়ে বঙ্গদর্শনের বক্তব্য : 'সকল দিক বিবেচনা করিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, হেমলতা নাটক এখনকার প্রচলিত অনেক নাটক অপেক্ষা অনেকাংশে উত্তম। ইহা পাঠকালে মনোমধ্যে নানা রসের উদয় হয় এবং বোধহয় অভিনীত হইলে সম্পূর্ণ মনোরঞ্জক হইবে'। (আলোচনাটি অক্ষয়চন্দ্রের, বঙ্কিমের নয়) *

*বঙ্গদর্শন ও বাংলা সাহিত্য/অক্ষয়চন্দ্র সরকার অধ্যায়।

সাধারণীতেও অক্ষয়চন্দ্র সরকার শরৎ-সরোজনী প্রভৃতি অবলম্বনে বাংলা নাটকের একটি সমীক্ষা প্রকাশ করেন (৬ই পৌষ, ১২৮১)। একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য : 'আধারের অতি বিস্তারের জন্য রসের গভীরতার হানি হয়। —হেমলতার কমলা দেবীর আবির্ভাবে এই দোষ আছে। কিন্তু তাহাতেও ক্ষতি নাই, কমলাদেবীর প্রসঙ্গ না থাকিলেও হেমলতা নাটক রসহীন বা অর্থহীন হয়না।' 'বাংলা নাটকে চরিত্রানুরূপ গানের অভাবের কথা আলোচনা করে অক্ষয়চন্দ্র নিধিরামের একটি গানকে চরিত্রোপযোগী বলে প্রশংসা করেছেন।'

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ করেন বঙ্কিমচন্দ্র। গ্রন্থসম্পাদনার কালে তিনি গুপ্তকবির অনেক রচনা আংশিক বা সম্পূর্ণ বর্জন করেন। ভূদেব এই সম্পাদনা পদ্ধতি পছন্দ করেন নি। কেননা গ্রাম্যতা বা অশালীনতাদোষের কোন চিরকালীন মাপকাঠি নেই। একযুগে যা অশালীন বা গ্রাম্যতাদুষ্ট, অন্য যুগে তা বাস্তব সত্যের নিরাবরণরূপ হিসেবে অধিকতর গ্রহণীয় হয়ে উঠতে বাধা নেই। ভূদেব বঙ্কিমের বর্জন পদ্ধতির বিরুদ্ধে। কারণ 'এ বই তো পাঠশালার বালক-বালিকারা পড়িবে না—ইহাতে পরিত্যাগের গর্হিত প্রণালীটি অবলম্বিত না হওয়াই উচিত ছিল।' গুপ্ত কবি সম্পর্কে বঙ্কিমের সিদ্ধান্তগুলি মেনে নিলেও সম্পাদন পদ্ধতি বিষয়ে আপত্তি থাকে। এবং এই আপত্তি সমালোচক ভূদেবের সংস্কারমুক্ত উদার মানসিকতার সাক্ষ্য দেয়।

ঘ. রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : প্রভাত সঙ্গীত, বিবিধ প্রসঙ্গ. প্রকৃতির প্রতিশোধ

ভূদেবের ধর্মচেতনা, ইহ ও পরকালের মঙ্গলবোধ, সমাজচিন্তা সঙ্গত কারণেই রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ, মঙ্গলবোধ এবং সমাজচিন্তা থেকে পৃথক। এই দুই মনীষীর পারিবারিক পরিবেশ এবং যুগপ্রেক্ষিতও অনেকাংশে ভিন্ন। ১৮২৫ সালের চুঁচুড়ার নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পরিবার এবং ১৮৬১ সালের জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার এক হতে পারেনা। দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমল থেকেই পশ্চিমী দুনিয়ার হাওয়া ঠাকুর পরিবারে প্রবেশ করেছে। ভূদেবের আচার প্রবন্ধ রচিত হয় ১৮৯৪ সালে, তাতে প্রত্যূষ থেকে রাত্রি পর্যন্ত ধর্মবিহিত আচার-বিধান স্থান পেয়েছে : যুক্তি এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক সেখানে একেবারে গৌণ। প্রভাত সঙ্গীত 'সামাজিক প্রবন্ধ' রচনার প্রায় সমকালীন। ভূদেবের স্বচ্ছ সাহিত্যদৃষ্টির প্রমাণ এই যে তিনি মূলতঃ সামাজিক স্থিতাবস্থার পক্ষপাতী হলেও রবীন্দ্র রচনাকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জানাতে পেরেছিলেন।

প্রভাত সঙ্গীত বিষয়ক রচনাটি ধারাবাহিক এডুকেশন গেজেটে প্রকাশের পর রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে একটি সংকলনে বিধৃত হয়েছিল।* প্রবন্ধটির সারমর্ম :

*রবীন্দ্র সাহিত্য সংগমে/সঃ শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

১· রবীন্দ্রনাথ একজন আর্যকবি।—আর্য কবির ভাব, আমি প্রকৃতির। ইউরোপীয় কবির ভাব, আজিকালি যদিও একটু পরিবর্তিত হইতেছে, কিন্তু আদৌ প্রকৃতি আমার'।

২· প্রমাণ ভিক্টর হুগোর রবীন্দ্র-অনূদিত 'কবি' এবং তাঁর নিজের 'ওই দেখ ফুটে ওঠে ফুল'।

৩· ইউরোপীয় নাহংকে অহং করিতে চায়, আর্য অহংকে নাহং এমন করেন। একজনের ধর্ম আত্মসাৎ করা, অপরের ধর্ম আত্মবিসর্জন করা। ফলে দুই এক। কারণ এক হওয়া দুয়েরই উদ্দেশ্য।

৪· 'মহাস্বপ্ন' কবিতা ও মায়াবাদ।

'কভু কি আসিবে, দেব, সেই মহা স্বপ্নভাঙ্গা দিন। সত্যের সমুদ্র মাঝে আধসত্য হয়ে যাবে লীন ?' একজন প্রকৃত কবি একটি মাত্র কথায় সমুদায় তর্কের মীমাংসা করিয়া প্রকৃত বিষয়টি বুঝাইয়া দিলেন আর ইংরাজি-নবিশের কাছে বার্কলির গ্রন্থ হইতে মায়াবাদ শিখিবার প্রয়োজন রহিল না।

বিবিধ প্রসঙ্গ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৩ সালে। এডুকেশন গেজেটে সমালোচিত হয় ৫ই অকটোবর ১৮৮৩।

আসলে বইটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সমষ্টি। বিষয়গৌরবী রচনা নয়। প্রকাশ-রীতিও যুক্তি-তথ্যাশ্রয়ী নয়। উপলব্ধির ঐশ্বর্যই প্রবন্ধগুলির আকর্ষণ। প্রবন্ধগুলি আয়তনে ছোট, কিন্তু ব্যঞ্জনাগর্ভ। ভূদেব রবীন্দ্রমানসের গভীরে পৌছতে পারেন নি। কিন্তু লেখাগুলি যে ইংরেজি 'রিভিউ বা মাগাজীনের আদর্শানুসারী' নয়, এবং 'কবিত্বের উৎকৃষ্ট অলংকার দ্বারা অবশ্যই ভূষিত।'— এ সত্য তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

ভূদেবের মন্তব্য :

'যিনি প্রকৃত কবি তিনি পদ্যই লিখুন, আর গদ্যই লিখুন, তাঁহার রচনা কবিত্বের উৎকৃষ্ট অলংকার দ্বারা অবশ্যই ভূষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন প্রতিভাসম্পন্ন প্রকৃত কবি। তাঁহার লিখিত এই গদ্যময় বিবিধ প্রসঙ্গে যথেষ্ট কবিত্ব আছে। এমন একটি প্রসঙ্গ নাই যাহাতে গ্রন্থকারের রুচির ঐকান্তিক পবিত্রতা, মানসচক্ষে সূক্ষ্মদর্শন এবং আধ্যাত্মিক মহোন্নতির লক্ষণ সকল পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে লক্ষিত না হয়।'

প্রকৃতির প্রতিশোধ নাট্যকাব্যটি রবীন্দ্রকবিমানসের একটি সন্ধিপর্বের পরিচয়বহ। নিছক সন্ন্যাসীর রূপকে তত্ত্ব প্রচারই ('যেমন কুমীরের সহিত বাদ

করিয়া জলে থাকা যায় না, তেমনি প্রকৃতির সহিত বাদ করিয়া পৃথিবীতে থাকা অসম্ভব') এই নাটকের চরম কথা নয়। 'বৈরাগ্যাবলম্বনের কৃতকার্যতা অনুভব করিয়া সে দম্ভী হয়, কিন্তু পরে সংসারের মোহমন্ত্রে পুনরায় আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।'—এ ব্যাখ্যা ভুল নয়, তবে অতি সরলীকৃত। যিনি অসীম, জগদীশ্বর, রূপরস বর্ণগন্ধের লীলানিকেতনেই সেই লীলাময়ের অধিষ্ঠান—তার বাইরে অর্থাৎ শাস্ত্রে এবং মন্দিরে তাঁকে খোঁজা বৃথা। সীমাসংসারের মধ্যে সর্বত্র অসীমের সিংহাসন পাতা রয়েছে। তাকে চেনা-জানাই হচ্ছে প্রকৃত মোহমুক্তি। প্রকৃত ধর্মের উদ্বোধন। অস্পৃশ্য রঘুদুহিতা সেই কাজটি সিদ্ধ করেছে।*

তবু এ কথা সত্য, ভূদেব রবীন্দ্র সাহিত্যে শাশ্বত ভারতের বাণীকে ঠিকই চিনেছিলেন এবং মুক্তকণ্ঠে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। দেখার ভঙ্গি এবং প্রকাশরীতির পার্থক্য সত্ত্বেও এই অভ্রান্ত 'ভারত সত্য' বা 'আর্য সত্য' আবিষ্কার বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

ঙ· রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস

বঙ্কিমচন্দ্র এই ছোট ৯০ পৃষ্ঠার বইটিকে বলেছেন, 'মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু স্বর্ণের মুষ্টি।' প্রসঙ্গত বাংলার ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য, বাংলার ইতিহাসের উপাদান, ইতিহাসের বিভ্রম এবং শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য উল্লিখিত হয়েছে। ভূদেবও এডুকেশন গেজেটে জাতীয় ইতিহাসের আদর্শ বিবৃত করেছেন। ভূদেবের উক্তি: 'যাহাতে জাতীয় জীবন চরিত বর্ণিত হয়, তাহাই প্রকৃত ইতিহাস। তাহা জাতি বিশেষেরই উদয় উন্নতি ও অবনতির চিত্র। আমাদের দেশে ইহার নামগন্ধও নাই। কিন্তু সম্প্রতি রাজকৃষ্ণবাবু যে ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন ইহাতে এই বৃহৎ ব্রতের সূচনা হইয়াছে।'

বঙ্কিম ও ভূদেবের সমালোচনা একই সময়ের। উভয়েই ১২৮১ সালের মাঘে সমালোচনা লেখেন। এর আগে সাধারণীতে অক্ষয়চন্দ্র সরকারও (২৭শে পৌষ, ১২৮১) বইটির অনুরূপ প্রশংসা করেন। উপসংহারে সাধারণীতে লেখা হয়: 'সকলে দেখিবে এই ইতিহাসের লেখা যেমন পরিষ্কার ও রচনা যেমন সুমিষ্ট ও অল্পস্থানে কত নূতন নূতন কথা আছে।' ভূদেবও রাজকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনাগুণের প্রশংসা করেছেন।

'ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ' শীর্ষক রাজনারায়ণের পুস্তিকায় ব্রাহ্মধর্মের প্রশংসা

*রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ ও শিশুচিত্ত—ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য/রবীন্দ্রচর্চা। পৃ ১৭৭-১৮৯

করা হয়েছে। সেকালের গোঁড়া হিন্দুদের দিক থেকে তাতে খুশী হবার কথা নয়। কিন্তু ব্রাহ্ম আন্দোলন বিষয়ে ভূদেবের একটি নিজস্ব ধারণা ছিল। তাই তিনি রাজনারায়ণের প্রশংসায় মুখর হতে পেরেছেন। তাঁর ধারণাটি কৌতূহলোদ্দীপক :

'ব্রাহ্মদিগের বিষয় যখন ভাবিয়াছি তখনই পৌরাণিক বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ সংবাদ আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে। আমার মতে নিরীহ হিন্দু জাতিই বশিষ্ঠ, কামধেনু হিন্দুধর্ম, বিশ্বামিত্র প্রবলপ্রতাপ রাজধর্ম এবং কামধেনুশরীর নিঃসৃত ম্লেচ্ছগণ ব্রাহ্মমতাবলম্বী আধুনিক যুবকবৃন্দ। ব্রাহ্মদিগের রূপ ধারণ করিয়াই সনাতন হিন্দুধর্ম আপন প্রভাব প্রকাশপূর্বক খ্রীষ্টধর্মকে সুদূরপরাহত করিলেন। কামধেনুপ্রসূত বিদ্বেষবিবর্জিত ঐ ব্রাহ্মধর্মের জয় হউক।' এই রূপক-দর্শন সাহিত্যভাবুক ভূদেবেরই মনন-লব্ধ কল্পনার পরিচয়বহ।

রাজনারায়ণ, ভূদেব ও বঙ্কিম সমাজে ও আচরণে তিন ভিন্নপথের পথিক। কিন্তু সাহিত্যভাবনায় তিনজনে অনেক সময় পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এসেছেন। তিনজনেই কমবেশি সামাজিক কল্যাণ ও সৌন্দর্যসৃষ্টির যুগ্ম লক্ষ্যে সাহিত্যিক ফলশ্রুতির পূর্ণতা খুঁজেছেন। উনিশ শতকের সেই সংঘাত-জর্জর দিনগুলিতে কলাকৈবল্যবাদ চূড়ান্ত প্রশ্রয় পেতে পারেনা। বিশেষ লক্ষণীয় যে অশ্লীলতা, অগভীরতা, স্বদেশহিতৈষণার নামে অতি-ভক্তি, উচ্ছ্বাসবাহুল্য, চিত্তাকর্ষণের তাগিদে চমকপ্রদ ঘটনাসংযোজন প্রভৃতিকে তিনজনের কেউই প্রশ্রয় দেননি।

পরবর্তী অংশে ভূদেবের সাহিত্য সমালোচনামূলক কয়েকটি রচনার পর্যালোচন করা হয়েছে। আমাদের মতে আচারনিষ্ঠ ভূদেবের অন্তরালে একজন যথার্থ সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যবিচারক সত্তার অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে।

বিবিধ প্রবন্ধ : প্রথম ভাগ

বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ভাগ তিনটি প্রবন্ধের সমষ্টি। কিন্তু এই তিনটি রচনার মধ্যে ভূদেবের একটি নতুন পরিচয় ফুটে উঠেছে। সামাজিক পারিবারিক আচার প্রবন্ধে আমরা মনস্বী হিন্দু ব্রাহ্মণ রূপে তাঁর সমাজবোধ, জাতীয়তাবোধ পরিবার চেতনা এবং সংস্কারমনস্কতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এখানে নৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কার গৌণ, তাঁর সারস্বত বুদ্ধির অনবদ্য প্রকাশে রচনাগুলি সমুদ্ভাসিত।

ভবভূতির উত্তররামচরিত, শ্রীহর্ষের রত্নাবলী ও শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক

আলোচনায় ভূদেব তিনটি প্রতিভূস্থানীয় সংস্কৃত নাটকের রসগ্রাহী বিশ্লেষণ করেছেন। তিনটি নাটকের প্লট ভিন্ন, লক্ষ্য ভিন্ন, সুতরাং রচনা শৈলীও ভিন্ন। ভূদেব দেখিয়েছেন, কবি প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্যই এর মূল।

বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরচরিত প্রকাশের পর ভূদেবের 'উত্তর চরিত' রচিত। (১২৮৭ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩০শে শ্রাবণের মধ্যে এডুকেশন গেজেটে ধারাবাহিক বেরিয়েছিল) প্রথমেই বঙ্কিমের রচনার উল্লেখ আছে।

'বঙ্গদর্শন-সম্পাদক মহাকবি ভবভূতি প্রণীত উত্তর চরিতের এক উৎকৃষ্ট সমালোচনা বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ অভিমত প্রকাশ করিব।'

বঙ্কিম ও ভূদেবের উত্তর রামচরিত বিশ্লেষণ পরস্পরের সম্পূরক। দুজনেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মন্তব্য উদ্ধার করেছেন, দুজনেই তাঁর থেকে ভিন্নমত। পার্থক্য এই, বঙ্কিমের অভিপ্রায় নৃসিংহনারায়ণ ভট্টাচার্যের অনূদিত উত্তর চরিত সমালোচনাচ্ছলে সমগ্র নাটকের রসাস্বাদন, ভূদেবের লক্ষ্য তৃতীয় অংকের বিশদ পর্যালোচনা। যেহেতু বঙ্কিমের রচনার পরে ভূদেবের প্রবন্ধ রচিত, তাই বঙ্কিমের 'উত্তর চরিতে'র মূল সূত্র সর্বাগ্রে স্থান পেতে পারে।

১। ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর সামগ্রীগুলি একত্রিত করেন না, যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই অংকিত করেন। —মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।

২। ভবভূতির বর্ণনাশক্তির বিশেষ পরিচয়—দ্বিতীয় ও তৃতীয়াংকে জনস্থান এবং পঞ্চবটী এবং ষষ্ঠাংকে কুমারদিগের যুদ্ধ।

৩। রামায়ণের রাম ক্ষত্রিয়, মহোজ্জ্বলকুলসম্ভূত, মহা তেজস্বী।— ভবভূতির রামচন্দ্র তৎপরিবর্তে স্ত্রীলোকের মত পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিলেন।

৪। প্রথমাংক ও দ্বিতীয়াংকের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর কাল ব্যবধান। উত্তর চরিতের একটি দোষ এই যে নাটকবর্ণিত ক্রিয়া সকলের পরস্পর কালগত নৈকট্য নাই।

৫। দ্বিতীয়াংকের বিষ্কম্ভক যেমন মধুর, তৃতীয়াংকের বিষ্কম্ভক ততোধিক।

৬। অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার (ভবভূতি) সৃজনকৌশলের পরিচয় 'ছায়া' নামে উত্তরচরিতের তৃতীয়াংক।—ঈদৃশ রমণীয় সৃষ্টি অতি দুর্লভ।

ভূদেব প্রবন্ধের সূচনাতেই নির্দেশ করেছেন, তাঁর আলোচ্য বিষয় ভবভূতির তৃতীয় অংক মাত্র। 'উত্তর চরিত বৃহৎ পুস্তক, তাহার আদ্যোপান্ত সমালোচনা করিলে তাহা অতি বৃহৎ হইয়া উঠিবে। এইজন্য আমরা পুস্তকের তৃতীয়

অংকটি মাত্র গ্রহণ করিলাম।' প্রথমেই তমসা ও মুরলার কথোপকথনের একটি বিষ্কম্ভক। সীতাবিরহে রামের শোক 'কূটপাকের ন্যায়' হৃদয়কে দগ্ধ করছে, অথচ বাইরে তার প্রকাশ নেই। অযোধ্যায় ফেরার পথে রাম-সীতাসহবাসের বিশ্বস্ত সাক্ষী পঞ্চবটীবনে গেলে রাম নিশ্চয় বিচলিত হয়ে পড়বেন, তাই লোপামুদ্রা গোদাবরীকে অনুরোধ জানিয়েছেন, রাম যদি মূর্চ্ছাহত হন তখন গোদাবরী জলকণাসিক্ত সমীরণ দ্বারা যেন রামের মোহ অপনোদন করে। ছায়াময়ী সীতা তমসার সঙ্গে এবং রাম বনদেবী বাসন্তীর সঙ্গে আলাপ করেছেন। সীতা তিনজনকেই দেখেছেন, কিন্তু তমসা ছাড়া আর কারো দৃষ্টিতেই ধরা দেননি। রাম নিরন্তর সীতাচিন্তায় মগ্ন, সীতা মিলনের স্মৃতিযুক্ত বনস্থলীতে তিনি সীতাস্পর্শের সুখ অনুভব করেছেন। রাম ও ছায়াময়ী সীতার পঞ্চবটী প্রবেশ এবং তিরোধান, মুরলা এবং তমসার উক্তি দ্বারা ভবভূতি রাম-সীতার অন্তর্জগৎ সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। জানকীর পরিপাণ্ডু দুর্বল কপোল, গভীর বিরহব্যথা এবং করুণ রসমূর্তি—এই বর্ণনা পরোক্ষত সীতার ট্র্যাজেডি ব্যক্ত করেছে।

স্থান ও কাল বিষয়ে কয়েকটি সূক্ষ্ম সূত্র ভূদেব উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগরের মতে : 'উত্তর চরিত ভবভূতির সর্বপ্রধান নাটক। এই নাটক করুণ-রসাশ্রিত। বর্ণনাসকল কারুণ্য মাধুর্য ও অর্থের গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুর, ললিত ও প্রগাঢ়। ফলত শকুন্তলা আদিরস বিষয়ে যেমন সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, উত্তর চরিত করুণরস বিষয়ে সেইরূপ।' ভবভূতির কয়েকটি ত্রুটি যথা—দীর্ঘ সমাসবাহুল্য, প্রথমাংকে রামবিলাপের আড়ম্বর, কালগত নৈকট্যের অভাব সত্ত্বেও তৃতীয় ও ষষ্ঠ অংকের রসগ্রাহী আলোচনায়, বঙ্কিমচন্দ্রও অসাধারণ রসদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। 'ভবভূতির ভাষা অতি চমৎকারিণী। তাঁহার রচনা সমাসবহুলতা ও দুর্বোধ্যতা দোষে কলংকিত বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছে।'

• ভূদেব ছায়াসীতা মূর্তির নাটকীয় সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু কেন এই দৃশ্যের অবতারণা? ভূদেব দেখিয়েছেন, রাম ও ছায়াসীতার একই সময়ে পঞ্চবটী বনে প্রবেশ এবং তিরোধান বর্ণনায় ভবভূতির কল্পনা চমৎকারিত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

> 'ছায়াময়ী সীতামূর্তি যে একটি অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ওকথা বলায় অর্থবোধের কিছু আধিক্য হয় না। উহা কবির কল্পনা

এ-কথা বলিয়াও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।—অতএব ভবভূতির ঐ ছায়াময়ী সীতার প্রকৃত উপাদান কি তাহা অনুসন্ধেয় হইতেছে।'

মুরলা বলেছেন, রামভদ্র আগত প্রায়, অমনি তমসার উত্তর—পরিপাণ্ডু দুর্বল কপোলা, 'বিলোল কবরী'—করুণ রস বা বিরহব্যথা যেন জানকীর মধ্যে শরীরী হয়ে উঠেছে—ঐ যে তিনি আসছেন। বিশেষণগুলির মধ্যে সীতার বিরহদীর্ণ হৃদয় ও শরীরের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পঞ্চবটীতে প্রবেশ করেই সীতা বনদেবী বাসন্তীর কণ্ঠস্বর শুনেছেন, 'প্রমাদঃ প্রমাদঃ।' রামও অতীতের ভাবানুষঙ্গে মোহাবিষ্ট অবস্থায় শুনেছেন, 'প্রমাদঃ প্রমাদঃ' ইত্যাদি।

দুটি ভিন্ন সময়ে কি বাসন্তী ঐ কথাগুলি বলেছেন? ভূদেবের মতে বিপদ যখন আসন্ন, তখনি লোকে চীৎকার করে। নাটকের দুটি স্থানে এ উক্তি থাকলেও দুয়ের মধ্যে 'কালাত্যয়' হয়েছিল মনে করা ভুল। ভূদেবের ব্যাখ্যাটি উদ্ধারযোগ্য: 'তিনি প্রথমত দেখাইয়াছেন যে সীতা পঞ্চবটীর যে স্থানে, রামও পঞ্চবটীর সে স্থানে ছিলেন। সীতা রামের কথা শুনিতে এবং রামকে দেখিতে পাইতেছিলেন। আবার তাহা অপেক্ষাও যেন স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত কবি সীতাদেবীর মুখ দিয়াই বলিয়া দিয়াছেন যে, বাসন্তীর ঐ দুই বারের উক্তির মধ্যে কিছুমাত্র কালাতিপাত হয় নাই—প্রত্যুত উহা এক্‌বারেরই উক্তি এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে।'

সীতা ও তমসা এবং রাম ও বাসন্তীর কথোপকথন উদ্ধৃত করে ভূদেব সত্যই 'ভবভূতির সাগরচিত্তাভিজ্ঞতার বিষয় কিছু বিশেষ করিয়া' ব্যাখ্যা করেছেন। তমসার অপ্রণয়ব্যঞ্জক 'ঐক্ষাকো রাজা' উক্তির পরে সীতার 'রাজা' উচ্চারণ নাট্যকারের গভীর অনুভবশক্তির পরিচায়ক। সপ্তম অংকে সীতা অরণ্যে পরিত্যক্ত এবং প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে ভাগীরথীজলে দেহত্যাগ করলে পৃথিবী তাঁকে কোলে নিয়ে ভাগীরথীকে বলেন—

> যুক্তমেতদ বা রামভদ্রস্য
> ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে বালেন পীড়িতঃ।
> নাহং ন জনকোনাগ্নির্নানুবৃত্তির্ন সন্ততিঃ।

মায়ের এই মনোভাব একান্ত বাস্তব, ঘটনার উপযোগী, তবু ঐ অবস্থাতেও সীতা রামের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বশে রামের নাম শুনেই 'হা অজ্জউত্তং' বলেছেন। সর্বংসহা পৃথিবীও যেন সীতার এই অভিমানশূন্যতায় বিরক্ত— 'আঃ কস্তবার্জপুত্রঃ।'

সীতার উক্তি 'জংহোদু তংহোদু' অর্থাৎ 'যা হয় হোক' কথাটির মধ্যে

ভবভূতি গভীর ব্যঞ্জনা যোগ করেছেন। পরিত্যাগজনিত গূঢ় অভিমানে স্বভাব ভীত সীতার হৃদয় আশংকায় পূর্ণ। তাঁর মনে ভয় ছিল, 'আমি পরিত্যক্ত পত্নী, স্বামীর শরীর স্পর্শে আমার অধিকার কি ?' পাছে রাম রুষ্ট হন, তাই ভয়ে ভয়ে হলেও অন্তরের প্রিয় আকাঙ্ক্ষাটি ব্যক্ত হয়েছে, আমার ভাগ্যে যা হবার হোক বলেই তিনি রামের দেহ স্পর্শ করলেন। সীতার স্পর্শে রামও আনন্দে উচ্ছ্বসিত। সীতার মুখে 'ত্রিলোকনাথ' উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি 'জগৎপতি' আবার লোকনাথ অর্থাৎ প্রজাপালক রাজা। রামের মূর্চ্ছা ও চৈতন্য-প্রাপ্তি তাঁর গভীর চিত্তসন্তাপের পরিচয় দেয়। সীতার স্পর্শ যেন 'নিপীড়িত চন্দ্রকরকলাপের অভিষেক.' 'তাপিত জীবনতরুর পরিতর্পণরূপ সঞ্জীবনৌষধিরস'। সীতা এইটুকু শুনেই পরিতৃপ্ত, 'এত্তিতং তস্মে অবু দানী, যেবহুদরং'—রাম জ্ঞান ফিরে পেয়েই সীতাকে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। 'প্রিয়ে জানকি' সম্বোধনে যেমন রামের চিত্তব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি পরিত্যাগজনিত অপমানের পর সীতার কিঞ্চিৎ আত্মশ্লাঘাও লক্ষ্য করা যায়। তাই অভিমানবশে সীতা বলেছেন, 'আর্য পুত্র নিশ্চয়ই এ অসদৃশ কথা—সেই সেই বৃত্তান্তের পর'। ভূদেব এই অংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন :

> পাঠক কবির কৌশল দেখুন, রামের উপর সীতার কোপ যে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, তাহা তিনি কেমন দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রথমের 'নিশ্চয়ই অসদৃশ' এই দুইটি শব্দ মাত্র ক্রোধোক্তি, এবং উহাতেই ক্রোধের বিলয়। শেষের 'সেই সেই বৃত্তান্তের পর' এই কয়টি শব্দ রামকৃত অকারণ পরিত্যাগরূপ অপরাধের আবরণ।

কেবল তাহাই নহে, ঐ শব্দগুলি সীতার স্বামিত্যাগজনিত আন্তরিক লজ্জারও পরিব্যঞ্জক। তমসার উক্তি—'জানামি বৎসে জানামি। তটস্থাং নৈরাশ্যাদপিচ কলুষং বিপ্রিয়বশাৎ' প্রভৃতি ব্যাখ্যায় ভূদেব খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তি প্রকাশ করেছেন।

> এই শ্লোকে 'তটস্থা,' 'কলুষ,' 'উত্তম্ভিত,' 'প্রসন্ন,' 'গাঢ়,' 'দ্রবীভূত' এই সকল শব্দের দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে কবি নদীর সহিত সীতার হৃদয়ের রূপক কল্পনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং প্রথমে নদী তমসার 'আমি জানি, আমি জানি' এই বীপ্সাত্মক বাক্যে তাহার সূচনাও করিয়াছেন। সীতা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার মনে এ কি ভাব হইল জানিতে পারিতেছি না। তমসা বলিলেন, বাছা তুমি জান না, কিন্তু আমি ইহার ভুক্তভোগী—আমি জানি। আমার দীর্ঘ কালের পর বর্ষাগম, এবং পর্বতস্থা নীহার

সংঘাত দ্রবীভূত হইলে ঐরূপ হড়কাবাণ আসিয়া থাকে। তমসা যে নদী তাহা কবি নিজে তো ভুলেন নাই, পাঠককেও ভুলিতে দিলেন না।

ভবভূতির নিসর্গ-চেতনা উত্তররামচরিতের কাব্যসৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। সীতার দণ্ডকারণ্য স্মৃতি, আলেখ্য-দর্শন সমদুঃখভাগী সখীরূপে তমসা ও বাসন্তী এ-দুটি নদী-চরিত্রের অবতারণা ভবভূতির বিশিষ্ট নিসর্গ মানসিকতার পরিচায়ক। নিদাঘশীর্ণ নদীর হঠাৎ বর্ষাগমে কানায় কানায় ভরে-ওঠার সঙ্গে বিরহখিন্ন সীতার হঠাৎ রাম সন্দর্শনে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার সাদৃশ্য কল্পনাটি মনোরম। ভবভূতির সূক্ষ্ম রসচেতনার নিদর্শন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংক্ষিপ্ত 'প্রস্তাবে' ভবভূতির প্রশংসা আছে, কিন্তু এত বিশদ ও অনুপুঙ্খ রসবিশ্লেষণ নেই। বিদ্যাসাগর ভবভূতির একটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছেন। সেটি হল আদিরস বর্ণনার সংযম। কয়েকটি দোষের কথাও তিনি বলেছেন। তার মধ্যে প্রধান দোষ হচ্ছে সংলাপে সমাসবাহুল্য। ভবভূতি নিজে মালতীমাধবকে অত্যুৎকৃষ্ট নাটক বলেছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর বীর-চরিত. উত্তর চরিত এবং মালতীমাধবের তুলনাক্রমে সিদ্ধান্ত করেছেন: 'বোধহয়, সহৃদয় পাঠকমাত্রেই উত্তর চরিতকে ভবভূতির সর্বোৎকৃষ্ট নাটক জ্ঞান করিয়া থাকেন।'

বিদ্যাসাগরের পরে লেখা বঙ্কিমের 'উত্তরচরিত।' তাঁর আশু লক্ষ্য ছিল নৃসিংহ বাবুর উত্তররামচরিত অনুবাদ গ্রন্থের সমালোচনা, কিন্তু 'উত্তরচরিত' বস্তুত রসবোদ্ধা বঙ্কিমের অনবদ্য কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ। বিশেষ বিশেষ সংস্কৃত ও প্রাকৃত উক্তি উদ্ধৃত করে এবং সহজ সাধু গদ্যে সেই সেই অংশের অনুবাদ সংযুক্ত করেই বঙ্কিম ক্ষান্ত হননি। তিনি রাম ও সীতার মানসিক অবস্থা, ভবভূতির বর্ণনাকৌশলের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়েছেন ভবভূতির দোষ—যথা সমাসবাহুল্য, রামের বিলাপে আতিশয্য, কাল নৈকট্যের অভাব, ভাবের তুলনায় কার্য পরম্পরা গৌণ. পৌনরুক্তদোষ। বঙ্কিমের মতে উত্তররামচরিতের প্রথম ও তৃতীয় অংক শিথিল গতি, পুনরুক্তি-দুষ্ট। অবশ্য ছায়া সীতার পরিকল্পনাটি তিনি যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তাঁর মতে তৃতীয় অংক নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক।—'এই অংক পরিত্যক্ত হইলে নাটকের কার্যের কোন হানি হয় না।—বিশেষ ইহাতে রাম-বিলাপে দৈর্ঘ্য এবং পৌনঃপুন্য অসহ্য।' আবার একথাও তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে, 'কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচনা অতি দুর্লভ।' বোধহয় ভূদেব—বঙ্কিমের এই অনুকম্পায়ী মন্তব্যে খুশী হতে পারেন নি। বনদেবী বাসন্তীর কৃত

ছায়াবরণটুকু নাট্যকারের বিশেষ পরিকল্পনার সূচক। সেই পরিকল্পনা হল বাসন্তী ও তমসার মাধ্যমে নাটকের নায়ক-নায়িকা রাম-সীতার হৃদয়-উন্মোচন। আধুনিক সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ ঘটনাবর্ণনা নয়, ঘটনার প্রতিঘাতে সংক্ষুব্ধ মনোজগতের আলোড়নই মুখ্য। অনেকের কাছে যে তৃতীয় অংক 'অনাবশ্যক,' ভূদেব শুধু সেই অংকই বিশদ বিশ্লেষণ করে রাম-সীতার মনস্তত্ত্ব উদ্ঘাটনে ভবভূতির নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তিনি কালব্যবধান এবং পুনরুক্তি দোষেরও কাব্যগত প্রয়োজন প্রমাণ করেছেন।

সীতা-পালিত করীশাবককে দেখে যেমন রামের বিরহ উদ্দীপিত হয়েছে, তেমনি সীতা-পোষিত ময়ুর-ময়ুরীর মিলনকেলি দেখে রামের চিত্তপটে সীতা-মূর্তি উদ্ভাসিত হয়েছে।

ঐস্তেকহায়নকুরঙ্গ বিলোলদৃষ্টে স্তস্যাঃ পরিস্ফুরিতগর্ভ ভরালসায়াঃ।

ভূদেব অতীত স্মৃতিরোমন্থনের মধ্য দিয়ে ভবভূতির মনোবিশ্লেষণী নৈপুণ্যের প্রশংসা করেছেন। লক্ষণীয় যে আধুনিক ফ্ল্যাশব্যাক্ পদ্ধতি নাট্য-কৌশলরূপে উত্তর চরিতে ব্যবহৃত হয়েছে। বঙ্কিম উত্তরচরিতের সমালোচনা লেখার অব্যবহিত পরেই বিষবৃক্ষ লেখেন। সহৃদয় পাঠকের নিশ্চয় মনে পড়বে, 'স্তিমিত প্রদীপে' অধ্যায়ে বর্ণিত চিত্রসমষ্টি মাধ্যমে নগেন্দ্রহৃদয়ে সূর্যমুখী-বিরহের গভীরতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভূদেব তৃতীয় অংক অবলম্বনে ভবভূতির সেই চিরায়ত আধুনিকতার লক্ষণ ব্যক্ত করেছেন। ভবভূতির কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করে উত্তর রাম-চরিত প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে।

এক, রামের বিরহমালিন্যের পুনরুদ্রেক ও তজ্জন্য সমুদায় বাহ্য জগতে তাঁহার কষ্টের অনুভূতি, কবি এই সকল ভাব বর্ণন করিয়া উপাংকে সূচিত অনুতাপের সবিস্তার বর্ণনাবসরে মানব হৃদয়ের গূঢ়তম তত্ত্ব সমস্ত উদ্রেক করিয়া দিয়াছেন।

দুই, সীতা বর্জনের পূর্বমুহূর্তে রাম যে নিদ্রিত সীতার বাহু উপাধানটুকু অপসারণ করে নিয়েছিলেন সেকথা মনে পড়ায় রামের আক্ষেপোক্তি-অপূর্বকর্ম-চাণ্ডালময়ি মুগ্ধে বিমুশ্চমাম্। শ্রীতাসিচন্দন ভ্রান্ত্যাতুর্বিপাকং বিষক্রমম্॥

তিন, বাসন্তীর উক্তি 'অয়ি কঠোর যশঃ কিলতেপ্রিয়ং' উদ্ধৃত করে ভূদেবের ব্যাখ্যা—পাঠক দেখুন যে বনদেবী রামের যশোলিপ্সার তাদৃশ নিন্দা করিলেন না। কিন্তু যশের অভিলাষে তিনি যে অপকর্ম করিয়াছিলেন, তাহাতে ঘোরতর অপযশই হইয়াছে এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন।

চার, 'অজ্জ উত্ত এস ধরামি' ছায়াসীতার কথায় রামের বিলাপ 'হা প্রিয়ে

জানকী কাসি'—নাটকে নির্দেশ না থাকিলেও এইস্থলে রাম পুনঃপুনঃ ঐরূপ বিলাপ বাক্য কহিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়াছিলেন।'

পাঁচ, অনুতাপ পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র,—প্রায়শ্চিত্ত নহে। দুষ্কৃতির উপর অনুতাপ হইলে এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে আত্মার প্রকৃত ভাব (যাহাকে আধুনিকেরা আধ্যাত্মিক জীবন কহেন) এখনও বর্তমান আছে, সম্পূর্ণ বিকৃত হয় নাই।

ছয়, বস্তুত পঞ্চবটী বনে রাম একাকী, তাঁহার সীতা বিয়োগশোক উদ্দীপিত। সেই শোকের সময়ে বাহ্যজগৎ বাসন্তী তমসাদিরূপে এবং অন্তর্জগৎ ছায়াময়ী সীতারূপে তাঁহার অন্তরাত্মার প্রতি কিরূপ ঘাত-প্রতিঘাত করিতে ছিল কবি তৃতীয়াংকে তাহাই দেখাইয়াছেন।

রত্নাবলী সম্পর্কে ভূদেবের রচনাটিও উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত কলেজের পত্তনের সময় থেকেই রত্নাবলী পাঠ্যসূচীভুক্ত ছিল। রত্নাবলী প্রসঙ্গে বিদ্যা-সাগরের উক্তি উল্লেখযোগ্য : 'রত্নাবলী এক অত্যুৎকৃষ্ট নাটক—এমন উৎকৃষ্ট যে অনেকে রত্নাবলীকে যাবতীয় নাটক অপেক্ষা সমধিক মনোহর জ্ঞান করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক উৎকর্ষ অনুসারে পৌর্বাপর্যক্রমে গণনা করিতে হইলে শকুন্তলা ও উত্তরচরিতের পরে রত্নাবলীর নাম নির্দেশ হওয়া উচিত।'*

ভূদেব বিদ্যাসাগরের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। যদিও বিনয়ের সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, 'আমরা এইস্থলে যাহা বলিলাম তাহা তাঁহার সেই সংক্ষিপ্ত উক্তিরই ভাষাভূত,' কিন্তু তাঁর মত খণ্ডন করাই বোধহয় ভূদেবের লক্ষ্য ছিল। বিদ্যাসাগর রত্নাবলীর পূর্বে শকুন্তলা এবং উত্তর চরিতের নাম করায় একটা আপেক্ষিক উৎকর্ষের ধারণা ফুটে ওঠে। 'জগতের সকল বস্তুরই স্ব স্ব গুণ ধর্মে বিশিষ্টতা আছে।' অর্থাৎ তিনটি রচনা তুলনাযোগ্য নয়।

'বস্তুত উত্তর চরিত শকুন্তলা এবং রত্নাবলী এই তিনটি দৃশ্যকাব্য পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতির। তিনটি তিন প্রকারে প্রধান। উত্তর চরিত গাম্ভীর্যে, শকুন্তলা বৈচিত্র্যে, এবং রত্নাবলী পরিপাট্যে। সংস্কৃত কাব্যোদ্যানে তিনটিই বিকশিত কুসুম। কিন্তু তিনটিই এক জাতীয় কুসুম নহে। উহাদের মধ্যে একটি পদ্ম, একটি গোলাপ এবং একটি নবমল্লিকা।' উদ্ধৃত অংশের মধ্যেই ভূদেবের রসজ্ঞ মনের পরিচয় আছে। উপমা তিনটি সম্প্রসারিত করে তিনি

*সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব। পৃ-১২৫। সাক্ষরতা প্রকাশন সং।

বলেছেন, পদ্মটি দেবভোগ্য, গোলাপ বিলাসের ফুলের তোড়া, নবমল্লিকা বিভবশালীর আরাম।

সবচেয়ে বড় কথা ভূদেব গঠনশৈলী অনুযায়ী রত্নাবলীর বৈশিষ্ট্য বিচার করেছেন। সাধারণত সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় আলংকারিক দোষ গুণ এবং রস-বিচারই প্রাধান্য পায়। ভূদেব নিছক রসের দিক থেকে নাটক বিচার করেন নি। নাগানন্দ ও রত্নাবলীকে ভূদেব যেভাবে দেখেছেন পাঠককেও সেভাবে দেখাতে চান। তাঁর মতে নাগানন্দ ও রত্নাবলীর মধ্যে আভ্যন্তর সাদৃশ্য আছে। শুধু সাদৃশ্য নয়, দুয়ের মধ্যে 'অপূর্ব উৎকর্ষক্রমও লক্ষিত হয়।' নাগানন্দ অপরিণত বয়সের রচনা, রত্নাবলী পরিণতির সাক্ষ্যবহ। 'নাগানন্দের ভাব উচ্চ, বর্ণনা সরল, কিন্তু গ্রন্থন অপেক্ষাকৃত শিথিল।' রত্নাবলীর গ্রন্থন নৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসনীয়। নাগানন্দে লেখকের কিঞ্চিৎ বিদ্যাপ্রদর্শন আছে, রত্নাবলীতে আতিশয্য বিন্দুমাত্র নেই। 'নাগানন্দে অকৃতাস্বাদ ব্যক্তির সংসার সম্বন্ধে কল্পিত বর্ণনা, রত্নাবলীতে ভুক্তভোগীর সাংসারিক কার্যকলাপের বিবরণ।'

ভূদেব নান্দী, প্রস্তাবনা এবং অংক-চিহ্নিত নাট্য কাহিনী বিশ্লেষণ করে রত্নাবলীর গঠনপারিপাট্য আলোচনা করেছেন। তাঁর পূর্বে আর কেউ রত্নাবলীর এমন সুন্দর রসগ্রাহী সমালোচনা লেখেন নি। সামাজিক-পারিবারিক-আচার প্রবন্ধের লেখক যে ইচ্ছে করলে অন্যনিরপেক্ষ সাহিত্য মূল্যায়নে কত রসগ্রাহী ছিলেন তার প্রমাণ মেলে সাধারণভাবে 'বিবিধ প্রবন্ধে' (১ম খণ্ড), বিশেষত 'রত্নাবলী' প্রবন্ধে। পরবর্তীকালে আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার নিদর্শনরূপে ভূদেবের মৃচ্ছকটিক সমাদৃত হয়েছে।* কিন্তু রত্নাবলী প্রসঙ্গ সুধীবর্গের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। নীতি-বেত্তা ভূদেবই শেষ পর্যন্ত মৃচ্ছকটিকের রসবিশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আর্য হিন্দুর বীরতা, ধৃষ্টতা, উপেক্ষা, অপকর্মে ঘৃণা, সত্যে নিষ্ঠা, শরণাগতের প্রতিপালন, মরণে নির্ভীকতা ইত্যাদি। অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও বৌদ্ধদের সাত্ত্বিক প্রকৃতি নির্ণয় করাই তাঁর লক্ষ্য। প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন, 'ইউরোপীয়েরা রজোগুণ প্রধান। তাহারা কাম ক্রোধের একান্ত বশীভূত।' ভূদেবের সমাজচিন্তা এখানে তাঁর সাহিত্য বিচারের অনুপ্রেরক। তুলনায় রত্নাবলী বিশ্লেষণ যেমন অন্তর্ভেদী তেমনি এর প্রেরণা-উৎস নাটকের গঠনশৈলীর সৌন্দর্যমুগ্ধতা। অর্থাৎ নিছক সাহিত্যাস্বাদের

*বাংলা সমালোচনা সাহিত্য—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র পাল।

প্রেরণা বশেই প্রবন্ধটি রচিত। সংস্কৃত সাহিত্যের বাংলা সমালোচনা ধারায় এবং ভূদেবের সমগ্র রচনাসম্ভারে প্রবন্ধটি বিশেষ মর্যাদা দাবি করে।

রত্নাবলীর নান্দীর চারটি শ্লোকে নাটকের চারটি অংকের বিষয়বস্তু আভাসিত হয়েছে। নাগানন্দের নান্দীতেও সমগ্র নাটকের 'একটি দূর আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানুষের দেহধারণ ভোগ সুখের জন্য নয়, বাসনাদমন ও পরার্থসাধনের জন্য। স্পষ্টতই নাটকের নায়ক জীমূতবাহনের রাজ্যসুখত্যাগ, বিদ্যাধরী মলয়বতীর সঙ্গপরিহার, পরম কারুণিক জিনবুদ্ধের কৃপায় বাসনা-বিজয় প্রভৃতির আভাস দেয়। নান্দীর এই কৌশল রত্নাবলীতে অনেক পরিণত, অনেক সুপ্রযুক্ত। প্রথম শ্লোকের 'পাদাগ্রস্থিতয়া মুহুস্তনভরেণানীতয়া নম্রতাং' প্রভৃতি অংশে যে মধ্যভাগে পুষ্পাঞ্জলি প্রক্ষেপের কথা আছে, তার সঙ্গে সাগরিকার কুসুমাঞ্জলি প্রক্ষেপের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় শ্লোকের 'ঔৎসুক্যেন কৃতত্বরা সহভুবাব্যাবর্তমানা' প্রভৃতি শ্লোকে নবসঙ্গমে বরকে দেখে যে লজ্জা-ঔৎসুক্য বর্ণিত হয়েছে, তার সঙ্গে দ্বিতীয় অংকের সাগরিকার সংকেত গৃহে যাবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অথচ লজ্জা, পরিচারিকা সুসঙ্গতার সহায়ে বরের সঙ্গে মিলন এবং নবসঙ্গমে সাগরিকার লজ্জা বিশেষভাবে তুলনীয়।

নান্দীর তৃতীয় শ্লোকে কলহান্তরিতা নায়িকার তিরস্কার আছে। নাটকের তৃতীয় অংকের বর্ণনীয় বিষয়ঃ সাগরিকা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করতে যাচ্ছেন, এমন সময় রাজা উদয়ন দেখতে পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে লতাপাশ বিমুক্ত করে তিনি সাগরিকার বাহুপাশে নিজেকে নিক্ষেপ করে বললেন, 'হে জীবিতেশ্বরী আমার কণ্ঠে বাহুপাশ অর্পণ কর।' এই সাদর আলিঙ্গনের মুহূর্তে মহিষী বাসবদত্তার প্রবেশ এবং 'এ কাজ কি তোমার উপযুক্ত'—এই বলে তিরস্কার করেন। চতুর্থ শ্লোকে যেন চতুর্থ অংকেরই নাট্য বিষয়ের সংকেত পাই। নান্দীর চতুর্থ শ্লোকে দক্ষযজ্ঞ পণ্ডের উল্লেখ আছে। কিন্তু তার শেষ কথাটি ধ্বংসসূচক নয়, বরং অভয়দাতা শিবের প্রার্থনায় মধুর সমাপ্তির ইঙ্গিত আছে। নাটকের চতুর্থ অংকে ঐন্দ্রজালিকের কৌশলে রাজবাড়িতে অগ্নিদাহ এবং ধ্বংসের প্রতিরূপ, অন্তঃ-পুরিকাদের বিলাপ প্রভৃতি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।

নান্দীর পরে প্রস্তাবনা। এখানেও ভূদেব নাগানন্দের সঙ্গে রত্নাবলীর প্রস্তাবনার তুলনা করেছেন। নাগানন্দের প্রস্তাবনা কৌশলবিহীন। তুলনায় রত্নাবলীর প্রবেশ বর্ণিত হয়নি। রাজার সচিব যৌগন্ধরায়ন রঙ্গস্থলে এসেই প্রভুর সম্পর্কে শ্রদ্ধা, দৈবানুকূল্য এবং কার্যসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। এমন সময় দেখা গেল রাজা প্রাসাদের উপর বসে আছেন। তাঁকে দেখে

বললেন, প্রিয় সহচর, বসন্তকাকে সঙ্গে নিয়ে রাজা বসে আছেন, যেন স্বয়ং কন্দর্পদেব মদন মহোৎসব দেখছেন।

এরপরেই নায়কের প্রবেশ। তাঁর কথাতেও সচিবের উক্তির প্রতিধ্বনি। রাজ্যের শত্রু পরাজিত হয়েছে. উপযুক্ত মন্ত্রীর ওপর রয়েছে সমস্ত ভার, প্রজাদের বিপদ প্রশমিত। প্রিয়তমা প্রদ্যোৎ রাজকন্যা, বসন্ত ঋতু এবং তুমি উপস্থিত। 'অতএব মদনোৎসব নামে মাত্র, প্রকৃত উৎসব আমারই।'

ভূদেব তিনটি প্রস্তাবনা শ্লোকের অন্তর্নিহিত ভাবতাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথম শ্লোকে দর্শকদের কৌতুহল উদ্দীপিত করা হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে নায়কের রূপ গুণ প্রভৃতি এমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে তাঁর কার্যকলাপ দর্শনে দর্শকদের আগ্রহ জন্মেছে, তৃতীয়টিতে উৎসবের পরিবেশ, বসন্ত সময় প্রভৃতি দ্বারা দর্শকদের চিত্তরঞ্জন করা হয়েছে।

প্রথম অংকের গঠনপারিপাট্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিনটি মদন মহোৎসবের হওয়াতে কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভতা সহজেই দেখা দিতে পারে। সেটি নাট্যানুকূল বলেই গণ্য হবে। রাজার সামনে রাজ্ঞীর পরিচারিকাদের নৃত্য গীত, বসন্তকের মত্ততা, পরস্পর ঠাট্টা বিদ্রূপ, হাত ধরাধরি পর্যন্ত বেশ মানিয়ে গেছে। কিঞ্চিৎ ছলাকলা ও রঙ্গনৃত্যের পরেই পরিচারিকারা জানিয়েছে, বাসবদত্তা অন্তঃপুরোদ্যানে মদনদেবের পূজা করবেন, মহারাজকে উপস্থিত হতে আজ্ঞা করেছেন। ভূদেবের টিপ্পনি—'আজ্ঞা করিয়াছেন' বলিয়াই দাসী যেন একটু জিব কাটিল, তাড়াতাড়ি বলিল, 'প্রার্থনা করিয়াছেন।' তারপর বসন্তকের কাছে রাজা আপন মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। অন্য দিন হলে 'প্রার্থনা'ই মানাত, সেদিন মদন মহোৎসব—সেদিন আজ্ঞা করাই মানায়। বলা বাহুল্য, হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়ে বেশ একটি হৃদ্য পরিবেশ গড়ে উঠেছে। এই অংকে রাজার আত্মগৌরব এবং রানীর প্রতি ভালবাসা ও সমীহভাবের পরিচয় মেলে। রাজ্ঞী সেখানে উপস্থিত হয়েছেন দেখেই রাজা বসন্তকের কাছে বাসবদত্তার রূপ বর্ণনা করেছেন—

কুসুম-সুকুমার-মূর্তি-র্দধতী নিয়মেন তনুতরং মধ্যং।
আভাতিমকরকেতোঃ পার্শ্বস্থ চাপযষ্টিরিব।

রাজা শুধু প্রেমিক নন, কবিও। কুসুমসুকুমার মূর্তি কোন দেবী যেন নিয়মচর্যার দ্বারা কৃশতর মধ্য ধারণ করে মকরকেতুর পাশে যষ্টির মতো প্রকাশমান। এইভাবে রাজা ও রানীর কথোপকথনে মধুর দাম্পত্য চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। শ্রীহর্ষ কৌশলে জানিয়েছেন, প্রথম দুটি শ্লোকে রাজার

ভাবুক অথচ চপল প্রেমিক স্বভাবের পরিচয় আছে। 'আভাতি'—কোথায়? প্রকৃত প্রেমিকের কথা—আমার হৃদয়ে। উদয়ন বলেছেন, মকরকেতুর পাশে। নিজের প্রণয়িনীকে অনঙ্গদেবের চাপযষ্টি বলাও মানায় না। তৃতীয় শ্লোকে একটু সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয়েছে। অনঙ্গ অঙ্গহীন বলে তোমার পাণিস্পর্শসুখ পাচ্ছেন না। অর্থাৎ রাজা নিজে কন্দর্পের চেয়ে ভাগ্যবান, কারণ তিনি বাসবদত্তার পাণিস্পর্শ সুখ নিত্য অনুভব করেন। 'অতএব প্রেম যে ছিল না তাহা নহে। কিন্তু উহা তেমন সতেজ নয়—উসকাইতে উসকাইতে দেখা দেয়—আবার শীঘ্রই মিড়মিড়ে হইয়া পড়ে।'

রাত্রি সমাগম দেখে উদয়ন বলেছেন, এই পূর্বদিক পরিপাণ্ডুমুখে উদয় গিরির তটান্তরালে নিশান থেকে রমণীর হৃদয়গূঢ় দায়িত্বের ন্যায় সূচনা করছে। কথাটি কি রাজা বাসবদত্তার মুখের দিকে চেয়ে বলেছেন? প্রিয় স্বামীকে সামনে দেখে প্রেয়সীর মুখ 'পরিপাণ্ডু' হতে পারে না। এখানে 'পরিপাণ্ডু' বর্ণ অনুভূত বিরহেরই লক্ষণ। ভূদেবের টিপ্পনী স্মরণীয়: 'উদযন যেন মনে মনে ইচ্ছা করেন যে, কোন রমণী তাঁহাকে মনের ভিতর রাখিয়া পরিপাণ্ডুমুখী হয়। অংকের শেষ কবিতাটিতে কবি যেন পাঠকের চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়াই দেখাইয়াছেন যে বাসবদত্তার প্রতি উদয়নের সাত্ত্বিকভাবটি নিতান্তই মৃদু।' রত্নাবলীর এই অংশ ব্যাখ্যায় ভূদেব সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

শুধু কি বাসবদত্তার প্রতি উদয়নের প্রেমে সাত্ত্বিকতার অভাব, উদয়নের প্রতি বাসবদত্তার অনভূতিও অহংশূন্য নয়। পরিচারিকা সাগরিকাকে পূজার উপকরণ নিয়ে আসতে দেখে রাজ্ঞীর বিস্ময়—এ এখানে এল কেন? তিনি তাকে সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই সামান্য আচরণেই অবিশ্বাসের লক্ষণ স্পষ্ট। ভূদেবের কাছে রাম-সীতার দাম্পত্য প্রেমই আদর্শ দৃষ্টান্ত। সেখানে 'মদনের চাপযষ্টি,' 'নবীন কিশলয়,' 'প্রবাল বিটপী' ইত্যাদি মানায় না। প্রশ্ন হতে পারে, বাসবদত্তা যেন একটু বেশি নীরব। তিনি কি মকরকেতু পূজার অবসরে, বা পূজার শেষে দু চারটি কথা বলতে পারতেন না! একটু বিশেষ দৃষ্টিপাত, একটু অঙ্গভঙ্গির বৈচিত্র্যও প্রকাশিত হতে পারত। বাসবদত্তা সাধ্বী তেজস্বিনী, উচ্চ প্রকৃতি, তিনি উদয়নের মত ভাবহীন রসিকতা, সুখের অভাবে সুখের ভান মাত্র করতে পারেন না। এজন্যই অত চুপ চাপ। বাসবদত্তা যেন বুঝেছেন, উদয়নের হৃদয়ে অন্য প্রণয়ের অবকাশ আছে। তার পরের ঘটনাটিও নাটকের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। সাগরিকা বেশে রত্নাবলী অন্তঃপুরে ফিরে যেতে যেতেও যাননি। অন্তরাল থেকে রাজ্ঞীর

উদয়ন-পূজা দেখেছেন। তাঁর মনে হয়েছে প্রকৃত মদন দেবেরই অর্চনা হচ্ছে। এই ভেবে তিনিও কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। তাঁর মুগ্ধ বিস্ময় স্বতোৎসারিত হয়েছে—'অমোঘ দংসণোমে ভবিস্‌সসি বিট্টোবিপুণোপেকৃখি দব্বো।' বৈতালিকের উক্তি তাঁর ভুল ভেঙ্গে দিল। উনি কন্দর্পদেব নন, স্বয়ং রাজা উদয়ন। সঙ্গে সঙ্গেই রত্নাবলীর হৃদয়ে জাগল অপূর্ব প্রেম শিহরণ। এই সেই রাজা উদয়ন, যাঁর হাতে পিতা আমাকে সমর্পণ করেছেন।

সাগরিকা উদয়ন চিত্র অংকন ও সুসঙ্গতার সাগরিকা চিত্রাংকন শ্রীহর্ষের নাট্য চাতুর্যের পরিচয়বহ। ভূদেবের ব্যাখ্যাংশ উদ্ধৃত হতে পারে।

রত্নাবলীতে উদয়নের প্রতি সাগরিকার প্রেম যে অতি প্রখর তাহা অভিনয় কালে দর্শকেরা সাগরিকা কর্তৃক মদনভ্রমে রাজার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ হওয়াতে দেখিয়াছেন, উদয়ন নিজেও যে, সাগরিকার প্রেমের সম্যক প্রমাণ পাইবেন, কবি তাহারও বেশ যোগাড় করিয়াছেন। কিন্তু সাগরিকারও তো উদয়নের মনের গতি সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ চাই। সেরূপ প্রমাণ না পাইলে সেই লজ্জাশীলা রাজকুলবালা কেমন করিয়া আপনার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিবে? পদ্মপত্রে শয়নাদি ব্যাপার নির্বাহ করাইয়া কবি তাহারই উপায় করিয়া রাখিলেন।

শকুন্তলাবিরহের সঙ্গে সাগরিকা বিরহের পার্থক্যটিও সুন্দর হয়েছে। দুই নায়িকারই পদ্মপত্রে শয়নের কথা আছে, উদয়নের বিরহবিলাপ সাগরিকা অলক্ষ্যে শুনেছেন; রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার পদ্মপত্রশয্যা অলক্ষ্য থেকে দেখেছেন। শ্রীহর্ষ কোথাও বিরহ বর্ণনার বাড়াবাড়ি করেন নি। রাজার অশ্বশালা থেকে শেকল-ছেঁড়া বানরের উৎপাত, কদলী গৃহে সুসঙ্গতা ও সাগরিকার ভয়ে জড়-সড়ভাব, খাঁচা ভেঙে সারীর পলায়ন যথেষ্ট নাটকীয় ঘটনাসংঘাত সৃষ্টি করেছে। যেই পোষা সারী ধরতে দুই সখী কদলীগৃহ ছেড়ে গেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে রাজার প্রবেশ। দুটি কাহিনীকে কি অসামান্য নৈপুণ্যে শ্রীহর্ষ স্তরে স্তরে মিলিয়ে দিয়েছেন। রাজার এখানে আসার হেতু নবমল্লিকার ফুল দেখা। সে আর-এক কাহিনী। বাসবদত্তা-উদয়নের একটি দাম্পত্য চিত্র উপস্থিত করা হয়েছে। রানীর মাধবীলতা আর রাজার নবমল্লিকা—কোনটি আগে ফুল ফুটবে? তাই নিয়ে বাজি। রাজা নবমল্লিকা গাছে ফুল ফুটেছে কিনা দেখতে এসেই পেলেন সেই দুটি ছবি। কন্দর্প ও রতি, উদয়ন ও রত্নাবলী। তার সঙ্গে মিলেছে পোষা পাখির বুলি—'তুমি যেমন কন্দর্পের ছবি এঁকেছ, আমি তেমনি রতিদেবীর ছবি এঁকেছি বইতো নয়।'

রতিরূপা রত্নাবলী উদয়নের চোখে মানস সরোবরাভিমুখী রাজহংসীর মত। ভূদেব এই উপমায় উদয়নের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর উক্তি: 'রাজহংসী সাগরিকা উদয়নের হৃদয়পদ্ম বিকম্পিত করিয়া তাঁহার মানস সরোবরে প্রবেশ করিল।' উদয়ন বসন্তকের কাছে সেই ছবির যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। 'বাসবদত্তার রূপবর্ণন সম্বন্ধে যে রূপ শান্ত নির্মল রসিকতাপূর্ণ বাক্যাবলী নিঃসৃত হইয়াছিল সেরূপ নহে, একথাগুলি তীব্র লালসায় পরিপূর্ণ।' 'কৃচ্ছ্রাদূরুযুগং ব্যতীত সুচিরং ভ্রান্ত্বা নিতম্বস্থলে--জললবপ্রস্যন্দিনী লোচনে' উক্তির মধ্যে নারীশরীরলিপ্সু পুরুষের একটি বিশেষ দৃষ্টির প্রকাশ। অবশ্য এখানেও কবির মুন্সিয়ানা ভূদেবের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। রত্নাবলী কন্দর্পরূপী রাজার সামনে কি ভাবে বসেছিলেন? 'স্ত্রীজনোচিত' পদ্মাসনোপবিষ্টভাবেই রতিরূপা সাগরিকার ছবি অঙ্কিত হয়ে থাকবে। রাজা নিজে যদি ক্ষত্রিয়জনোচিত গরুড়াসনে উপবিষ্ট থাকেন, তা হলে রত্নাবলীর দেহশ্রী ঐভাবেই পরিস্ফুট হবে।

শ্রীহর্ষ এইবার সুকৌশলে দুটি কাহিনীকে মেলালেন। রত্নাবলীর উদয়ন অর্চনা সাগরিকার পূর্ণ-মানসিক প্রস্তুতির পরিচয়বহ, কন্দর্প ও রতির দুখানি চিত্রপট দেখে রাজার রূপমুগ্ধ উক্তি তাঁর মানসিক প্রস্তুতির পরিচায়ক। সুতরাং এরপরেই চাক্ষুষ সাক্ষাৎকারের আয়োজন। রত্নাবলী ও সুসঙ্গতা ফেলে-যাওয়া ছবি দুটি সংগ্রহ করতে কদলীগৃহের কাছে এসেই শুনতে পেল রাজা ও বসন্তকের আলাপ, সে বুঝতে পারল--পোষা পাখি সারীর মুখে রাজা সবই জেনেছেন। রাজার আচরণ এবং উক্তিতে রত্নাবলীর প্রতি আসক্তির অনেক লক্ষণই প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং সেই মুহূর্তে কদলীগৃহে সুসঙ্গতার প্রবেশ এবং 'রতিরূপে সখীকে চিত্রিত করায় তিনি আমার উপর রুষ্ট হয়েছেন, মহারাজ এসে ক্রোধ নিবারণ করুন'—উক্তি যেন রাজাকে সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। তিনি সরাসরি রত্নাবলীকে সম্বোধন করতে পেরেছেন। সবে সাগরিকার হাত ধরে রাজা বলেছেন—

শ্রীরেষা পাণিরপ্যস্যাঃ পারিজাতস্য পল্লবঃ
কুতোঽন্যথা স্রবত্যেষ স্বেদচ্ছদ্মামৃতদ্রবঃ।

এমন সময় শুনলেন, বাসবদত্তার আগমন সংবাদ—বসন্তকের মুখে। রাজা হাত ছেড়ে দিলেন, সুসঙ্গতা ও রত্নাবলী সরে দাঁড়ালেন।

বাসবদত্তার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, উদয়নের চরিত্র বিষয়ে অন্তর্ভেদী দৃষ্টির প্রমাণ পাই তাঁর শ্লেষপূর্ণ সংলাপে—'আর্যপুত্রের হাসি-হাসি মুখ দেখেই বুঝেছি নবমল্লিকার ফুল ফুটেছে। কিন্তু একি, ছবি দুটি কার?' দুটিই কি

বসন্তকের কারিগরি ? রাজা তাড়াতাড়ি রত্নাবলীর ছবি সম্পর্কে উত্তর দিয়েছেন, এটি মন গড়া ছবি—'কোন দৃষ্ট পূর্বার চিত্র নহে।' সঙ্গে সঙ্গে বাসবদত্তা রাজার হৃদয়ভাব উপলব্ধি করেছেন। বলা বাহুল্য, তিনি রতিরূপা সাগরিকাকে সনাক্ত করতে পেরেছিলেন। তাই কথার স্বরে ঝাঁঝ নিশ্চয় প্রকাশ পেয়েছিল—আর্যপুত্র, এই ছবিখানি দেখতে দেখতে আমার মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হল, সুখে থাক, আমি যাই।

এরপর রাজার আচরণ ও উক্তি যেমন নাটকীয় তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি বাসবদত্তার প্রতি তাঁর ভীতি-সমীহপূর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক। তাই রাজা অন্তঃপুরাভিমুখী বাসবদত্তার বস্ত্রাঞ্চল ধরে বলেছেন, 'প্রসন্ন হও, রাগ করোনা, আর এমন কাজ করবো না, আমার দোষ নেই—হয়তো আমার একথাও তুমি বিশ্বাস করবে না, তোমাকে যে কি বলবো ভেবেই পাচ্ছি না।'

উদয়ন চরিত্র ভূদেব সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। 'অসীদেতি' কথাতেই বোঝা যায়, রাগের কারণ রাজা মেনে নিয়েছেন, 'পুনরায় এমন আর হবে না' বলায় অপরাধ স্বীকারই করা হয়েছে। 'আমার দোষ নেই' ইত্যাদি উক্তি দুর্বল সাফাই মাত্র। বাসবদত্তা আঁচল ছাড়িয়ে নিয়েছেন—'অজ্জ উত্ত! মা অন্নধা সংভাবেহি'—সত্যি আমার মাথা ধরেছে! উভয়ের ভাবগোপন চেষ্টায় উভয়েরই অন্তর্জগৎ প্রস্ফুটিত। এই পর্যন্ত ভূদেবের রত্নাবলী নাটকের গঠন কৌশল ও চরিত্র বিচার। অতঃপর তিনি রত্নাবলীর উৎসে পৌঁছতে চেয়েছেন। বলা বাহুল্য, সামাজিক প্রবন্ধ আচার প্রবন্ধের তত্ত্বজিজ্ঞাসু মনীষাই সেখানে প্রধান, রস-জিজ্ঞাসা গৌণ।

কিন্তু সেটুকু পাঠকের যেন উপরি-পাওনা। তাই প্রবন্ধ শেষে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে তত্ত্ববিচার সংযুক্ত হয়েছে। সংস্কৃত কাব্য নাটকের উৎকৃষ্ট নায়িকা মাত্রেই কোমলা সরলা মুগ্ধা, বাসবদত্তার মত এমন আত্মদমন, এমন গাম্ভীর্য আর কোন নায়িকার দেখা যায় না। তার কারণ খুঁজতে রত্নাবলীর আকর গ্রন্থ 'বৃহৎকথা' বা 'কথাসরিৎ সাগরে' পৌঁছতে হবে। 'মুদ্রারাক্ষস' 'নাগানন্দ' এবং রত্নাবলীর উৎস—ঐ বৃহৎ কথা। নাটকের প্রয়োজনে শ্রীহর্ষ কাহিনীকে নিজের মত করে সাজিয়েছেন, নাটকের গঠনকৌশল তাঁর কুশলী শিল্পভাবনার পরিচায়ক।

কিন্তু রত্নাবলীর অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি গুণাঢ্যের অনুসারী। গুণাঢ্যে পাই, উদয়ন যখন গর্ভস্থ, তাঁর মা লোহিত হ্রদ থেকে উদয়াগিরি শিখরে গরুড় বাহিত হয়ে আসেনি। লোহিত হ্রদ সূর্যোদয়কালীন প্রাচী দিক; উদয়নের

মা কি উষা? উদয়ন নিজে কি সূর্যের প্রতিরূপ? শাস্ত্রের মতে 'সর্বদেবময়োহি সঃ' অর্থাৎ সূর্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সবই হতে পারেন।

কথাসরিৎ সাগরের ত্রয়োদশ তরঙ্গে আছে, তোমার পত্নী বাসবদত্তা মানুষী নন, দেবী, 'কারণবশাৎ অবতীর্ণা।' বাসবদত্তা কোন দেবী? একবিংশ তরঙ্গে আছে, গৌরী নিজ অংশে ভূমিতলে অবতীর্ণ হয়ে কামের জন্মহেতু শিবকে আরাধনা করবেন। চণ্ডমহাসেনের কন্যা বাসবদত্তাই সেই গৌরী। বলা হয়েছে, বাসবদত্তা সেই গৌরী এবং কামদেবের জননী। তাহলে কৃষ্ণের প্রধানা স্ত্রী রুক্মিণী ও গৌরী অভিন্ন। আবার শিব-আরাধনার দ্বারা কামের জন্ম হবে—এই কথায় হরি-হরের অভিন্নতা আভাসিত। লক্ষণীয় যে, রত্নাবলীর নান্দীর তৃতীয় শ্লোকটিরও কৃষ্ণপক্ষে এবং শিবপক্ষে অর্থ নিরূপণ সম্ভব।

তবে কি রত্নাবলী প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মত 'আধ্যাত্মিক বিষয়ে অভিনয়াকারে প্রদর্শন?' তা না হলেও উদয়ন-বাসবদত্তা-সাগরিকা কাহিনীর মধ্যে একটি গূঢ় ভাবতাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না। নাট্য সংলাপের ভাষায় দ্ব্যর্থবোধকতা, ঘটনাগ্রন্থনে ও নামকরণে শিষ্ট রূপকের ব্যবহার প্রমাণ করে, শ্রীহর্ষ আকরগ্রন্থের তত্ত্ব-ভাবনাকে বর্জন করেন নি, বরং নাট্যাকারে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

পুরাণের 'লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা তিস্রোভার্যা হরেরপি প্রেমাসমা স্তাস্তিষ্ঠন্তি সততং হরিসন্নিধৌ'-- উদ্ধৃত করে ভূদেব বলেছেন, বাসবদত্তা গৌরী রূপা, রত্নাবলী একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। বৃহৎকথার অনুসারে উদয়নের দ্বিতীয় রাজ্ঞী পদ্মাবতী। পদ্মাবতী লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই হতে পারেন। শ্রীহর্ষ বলেছেন প্রদ্যোতসুতা অর্থাৎ সরস্বতী, আবার লক্ষ্মী রত্নরাজির অধিষ্ঠাত্রী, সাগরিকার নাম রত্নাবলী, লক্ষ্মী সাগরসম্ভূতা, রত্নাবলীও সাগরিকা নামে পরিচিত। লক্ষ্মী বরুণদেবের কন্যা, রত্নাবলী সাগরোত্থিতা। এত সাদৃশ্য আকস্মিকভাবে সম্ভবপর নয়। শ্রীহর্ষ বৃহৎকথাকে ভিত্তি করে যে-আখ্যান নাট্যাকারে প্রকাশ করেছেন, তার পর্যবসান-এই তত্ত্বরঞ্জিত আধ্যাত্মিকতায়। অন্তত ভূদেব সেই প্রত্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীহর্ষের রত্নাবলী আলোচনা করেছেন। তাঁর উক্তি দিয়েই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাক।

> 'যে বাহ্যব্যাপারে তাঁহাদিগের (আর্যকবিদের) মনোনিবেশ হইত, তাহাই যেন সামান্য বাহ্যমূর্তি পরিহার করিয়া আধ্যাত্মিক আলোকে রঞ্জিত এবং পরিশেষে দেবলীলায় পর্যবসিত হইত।'

ভূদেবশিষ্য চন্দ্রনাথ বসু পরে রত্নাবলী বিশ্লেষণের পদ্ধতি গ্রহণ করেই

'শকুন্তলা তত্ত্ব' লেখেন। এ বিষয়ে অন্যত্র বিশদ আলোচনা করা যাবে। নাটকবিচারেও ভূদেব তাঁর সূক্ষ্ম রসজ্ঞান এবং প্রগাঢ় সমাজ তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

রচয়িতা শূদ্রক সম্পর্কে ভূদেবের নিজস্ব কোন সিদ্ধান্ত নেই। সম্ভবত তিনি যিশুখৃষ্টের দুশো বছর পূর্বে বা পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নাটকের আভ্যন্তর সাক্ষ্যে তাঁর মনে হয়েছে মৃচ্ছকটিক 'রামায়ণ এবং মহাভারতের পরবর্তী বটেই, রাজা চন্দ্রগুপ্তেরও কিছু পরবর্তী। কিন্তু তাহা অপেক্ষা অল্পদিনের বলিয়া কোনরূপেই প্রমাণিত হয় না।

সংস্কৃত নাট্য সমালোচকদের কাছে মৃচ্ছকটিক বিশেষ প্রশংসা পায়নি, কারণ — (ক) অলংকার পারিপাট্যের অভাব, (খ) বর্ণনা কৌশলের প্রতি উদাসীনতা। কিন্তু মৃচ্ছকটিকের 'গূঢ় রচনা কৌশলের ভূরি ভূরি প্রমাণ' ভূদেব লক্ষ্য করেছেন। সেই প্রমাণগুলি উপস্থিত করার আগ্রহেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। প্রথমেই বিচার্য নাটকের নান্দী। এ মাত্র দুটি শ্লোক, একটিতে আত্মসমাহিত ধ্যানী মহাদেবের ছবি 'জগৎশূন্য, সংসার শূন্য। দ্বিতীয়টিতে পাই হর-গৌরীর মিলিত রূপ তখন 'জগৎপূর্ণ, সংসার জাজ্জ্বল্যমান'।

নান্দীর ভাবব্যঞ্জনা মূল নাট্যবিষয়কে সংকেতিত করেছে। একদিকে নায়কের অকিঞ্চনতা, দরিদ্রতা, অন্যদিকে মহৎ প্রেমের সান্নিধ্যে সর্বশূন্যতার অবসান ও মধুর মিলনাত্মক পরিণতি।

নান্দীর পরে বিচার্য প্রস্তাবনা। 'প্রস্তাবনাটিও বিলক্ষণ কৌশলপূর্ণ।' প্রস্তাবনার বক্তব্য শূদ্রক নামে যিনি এই নাটকের রচয়িতা, তিনি রাজা, শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ, হস্তীযুদ্ধে পারঙ্গম ইত্যাদি। তিনি একশো বছর দশদিন জীবিত থেকে পুত্রকে রাজ্য দিয়ে চিতায় আত্ম বিসর্জন করেন। স্বভাবতই প্রস্তাবনাটির বাচ্যার্থ সংশয় জাগায়। যিনি শূদ্র তিনি কি করে দ্বিজ মুখ্য বা বেদবিদ হতে পারেন? কোন প্রস্তাবনাতেই কবির চিতারোহণ পর্যন্ত বর্ণনা নেই। তবে কি কবির অন্তরঙ্গ কোন শিষ্য বা অনুচর যিনি ঐ রাজ-কবির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনার সাক্ষী ছিলেন, প্রস্তাবনা অংশ এমন-কেউ লিখেছেন?

ভূদেব এইসব সংশয় সুন্দর নিরসন করেছেন। সমাজ বিষয়ে কিছু বলতে গেলে লেখকেরা প্রায়ই নাম গোপন রাখেন। সমাজের অধিকাংশ শূদ্র, তাই অধিকাংশের প্রতিনিধিরূপে তিনি 'শূদ্রক' নাম নিয়েছেন। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের গুণ সমন্বিত হলেই রাজা সমুদয় সমাজের প্রতিরূপ হয়ে ওঠেন। মৃত্যু বর্ণনারও একটি সামাজিক তাৎপর্য আছে। আমাদের শাস্ত্রীয় সংস্কার বলে শতবর্ষ হল

মানুষেব আয়ু, মৃত্যুর পবে দশদিন আত্মার ইহলোকে স্থিতিকাল। এই সংস্কার মনে রেখেই প্রস্তাবনায় শূদ্রকেব আয়ুকাল একশো বছর দশদিন বলা হযেছে।

প্রস্তাবনাব দ্বিতীযার্ধেব গানটি এই—

শূন্য পুত্রস্য গৃহং
চিরশূন্যং নাস্তি যস্য সন্মিত্রং।
মূর্খস্য দিশঃ শূন্যা
সর্বশূন্যং দরিদ্রস্য।

শেষ পংক্তিটি যেন মূল নাটকেব ধ্রু নাযক চারুদত্তেব সর্বশূন্যতাকে আভাসিত করেছে। চারুদত্ত আধুনিক কালেব নাযক নগেন্দ্রনাথ-গোবিন্দলালেব মত জীবনেব অভিজ্ঞতায বুঝেছে, 'সুখংহি দুঃখান্যনুভূয শোভতে ঘনান্ধকারে দ্বিব দীপদর্শনম। সুখাত্তু যো যাতি নবো দরিদ্রতাংস জীব দীপান্ধবণান্ধসাপ্নুতে।

নানা প্রতিকূল অবস্থায় চারুদত্তেব মানসিক প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হযেছে। ধনীর দুলাল দরিদ্র হয়েছেন, সেজন্য ততটা কষ্ট না, কষ্টএই যে ধনহীন হলে সৌহার্দ্যও শিথিল হযে পড়ে। দরিদ্রকে বন্ধুরা পছন্দ করে না, ভার্যাও তিরস্কার করে। সংসার ছেড়ে বনে যেতে ইচ্ছে করে। এখন তার অতিথি আসে না, লজ্জা, তেজহীনতা, পরিভব নির্বেদ শোক বুদ্ধিভ্রংশ দারিদ্রের ফল। কৌশলে নাট্যকার নাযককে প্রথম থেকেই উদাত্তগুণে বিভূষিত করে পরে আর একরূপে দেখিযেছেন। বযস্য মৈত্রেযের মতে দেবতারা যখন এতো পুজো পেযেও প্রসন্ন নন তখন দেবপূজা কর কেন? উত্তরে চারুদত্ত বলেছেন, গৃহস্থের এইতো নিত্য বিধি। তপস্যা মন বাক্য এবং বলি দ্বারা পূজিত হযে শান্ত ব্যক্তিদের প্রতি দেবতারা পরিতুষ্ট হন। সুতরাং কেন পূজা করবেন এ প্রশ্ন অবান্তর।

ভূদেব চারুদত্তের মধ্যে একজন খাঁটি আর্য হিন্দুকে পেযেছেন। 'এই আর্য, এই প্রকৃত হিন্দু। পৃথিবীর অপর কোন নরকুলে আর একরূপ বিশুদ্ধ আচরণ শিক্ষিত হয নাই।' বলা বাহুল্য, ভূদেব এখানে রত্নাবলী-বিশ্লেষণের মত গঠন পারিপাট্যের দিকে যাননি। অবশ্য সেখানেও রাম-সীতার চির-অম্লান প্রেমের গৌরবই মুখ, গঠন পারিপাট্যে লেখক রত্নাবলী-উদযন-বাসবদত্তার সঙ্গে হরি-হর-গৌরী-রুক্মিণীর সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। নীতিবেত্তা ভূদেব ইংরেজী শিক্ষিত একালের পাঠকের কাছে সংস্কৃত নাটকের আভ্যন্তর তাৎপর্য, তার নীতিগত মূল্য উপস্থিত করেছেন। নাটকরূপে মৃচ্ছকটিকের বিচার গৌণ হযে পড়েছে, নাযকের অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্রমবিকাশের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য দেওযা

হয়নি। আর্যশাস্ত্র ও সনাতন হিন্দু ধর্মের দৃষ্টান্তরূপেই চারুদত্তকে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। সর্বং শূন্যং দরিদ্রস্য—এই ধুয়াটি সারা নাটকে থীম-মিউজিকের কাজ করেছে।

চারুদত্তের মহনীয় চরিত্র দুঃখের অভিঘাতে উজ্জ্বলতর হয়েছে। তাঁর কয়েকটি উক্তি উদ্ধার করলেই শূদ্রকের চরিত্র বিশ্লেষণ রীতির আধুনিকতা প্রতিপন্ন হবে।

১. বন্ধু, অর্থ গেছে বলে আমার দুঃখ নেই. ভ্রমরেরা মদক্ষরণ কাল গত হলে হাতীর শুষ্ক কপোল পরিত্যাগ করে, সেরূপ অর্থহীন হয়েছি বলে অতিথিরা আমার গৃহ বর্জন করেছেন, সেই দুঃখের আগুনে আমি পুড়ছি।

২. নির্ধনতা সব আপদের আস্পদ।

৩. আমি প্রবল পুরুষদের বাক্যে এবং নিজের ভাগ্যদোষে যদিও আজ দূষিত হলাম, তবু যদি আবার ধর্ম জাগেন, তবে স্বর্গে হোক, মর্ত্যে হোক যেখানেই তিনি থাকুন—আমার কলঙ্ক তিনি ঘোচাবেন।

ভূদেব চারুদত্ত ও শর্বিলক সম্পর্কে বলেছেন, 'মৃচ্ছকটিকের মুখ্য পাত্র চারুদত্ত হিন্দু আর্য। তাঁহার ইচ্ছাবৃত্তি শাস্ত্র শাসনের অধীন। মৃচ্ছকটিকের গৌণ-পাত্র শর্বিলক ইউরোপীয় ছাচের লোক। তিনি সক্ষম, পণ্ডিত এবং তীক্ষ্ণধী। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাবৃত্তি অতীব প্রবলা– ধর্ম শাসনের ততটা বশীভূত নহে। একজন ইউরোপীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারের মতে মহাভারতের নায়ক যুধিষ্ঠির নহেন। উহার নায়ক অর্জুন। সেইরূপ আলংকারিকের চক্ষে মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত না হইয়া শর্বিলক হইলেই ভাল হইত।' এই উক্তি তাৎপর্য-ব্যঞ্জক। নায়ক নাটকের সর্বাধিক সক্রিয় চরিত্র—এই সংজ্ঞায় অর্জুন এবং শর্বিলক তুলনীয়। কিন্তু মহাভারতের পরিণাম স্বর্গারোহণ ও শান্তিপর্বের কথা মনে রাখলে যুধিষ্ঠিরই কেন্দ্রীয় পুরুষ। মৃচ্ছকটিকের পরিণামে চারুদত্তই মহিমান্বিত, শর্বিলকের চালাকি, বৈষয়িকতা একালের যুগ লক্ষণে চিহ্নিত মাত্র।

কিন্তু উত্তর চরিত বা রত্নাবলীর মতো মৃচ্ছকটিক সমালোচনায় ভূদেবের রসাস্বাদ প্রবণতার প্রমাণ নেই। চন্দ্রনাথ বসুর শকুন্তলা তত্ত্বের আর্য হিন্দু তত্ত্ব আবিষ্কারের সঙ্গে তুলনীয় ভূদেবের আর্য হিন্দুত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা। তাই এই প্রবন্ধে সাহিত্যকর্ম হিসেবে মৃচ্ছকটিকের বিচার নেই। তাঁকে মুগ্ধ করেছে আদর্শ আর্য হিন্দু চারুদত্ত, যার চরিত্রবত্তা 'ধৃষ্টতায় উপেক্ষা, অপকর্মে ঘৃণা, সত্যে নিষ্ঠা, শরণাগতের প্রতিপালন, মরণে নির্ভীকতা, যশোরক্ষায় যত্ন, ধর্ম-প্রভাবে বিশ্বাস এবং পরম অপরাধীর প্রতি ক্ষমা, এই সাত্ত্বিক ধীরতা।'

রত্নাবলী ও বাসবদত্তা চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবতাৎপর্য আবিষ্কারে ভূদেব যে অসামান্য মৌলিকতা দেখিয়েছেন, বসন্তসেনা চরিত্র বিশ্লেষণে তার পরিচয় মেলেনা। বসন্তসেনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'এই নায়িকার চরিত্রে একটু বিশেষ বৈচিত্র্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যটি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে হইলে সমাজ চিত্রই পরিষ্কাররূপে বুঝিবার প্রয়োজন হয়, এবং তাহা হয় বলিয়াই সমাজ-চিত্রাংকনে কৃতসংকল্প. মৃচ্ছকটিক রচয়িতার তাদৃশ নায়িকা লইয়াই নাটক রচনা।'

এখানে একটি বিচার-বিভ্রম হয়েছে। সাহিত্যিকের সমাজ-কল্যাণবোধ তাঁর সৌন্দর্যবোধ বা শিল্পপ্রেরণার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। 'সমালোচকের লক্ষ্য হওয়া উচিত লেখকের সমগ্র সৃষ্টি—তাঁর কলানৈপুণ্য এবং সমাজকল্যাণ চেতনা। কিন্তু ভূদেবের সমাজ কল্যাণমনস্কতা এখানে এক-দেশদর্শী, মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা যে নিছক 'সমাজ-চিত্রাংকনে কৃতসংকল্প—' তা মনে হয় না। মৃচ্ছকটিকের গঠন, কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র-উপস্থাপনাও বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। শর্বিলকের কাহিনী প্রসঙ্গে যে রাজনৈতিক পটভূমির অবতারণা, তার অভিনবত্ব সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের ব্যতিক্রম। চারুদত্ত শর্বিলকের বৈপরীত্য—নাট কারের গভীর মানব চরিত্রজ্ঞানের পরিচয় দেয়। কিন্তু সেই বৈপরীত্যকে নিছক সত্ত্ব ও রজোগুণের পার্থক্যরূপে চিহ্নিত করলে যথার্থ সাহিত্যবিচার হয়না।

ভূদেবের নিজস্ব হিন্দু সংস্কার, সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যে পূর্ণ আস্থা এখানে সাহিত্য-বিচারে বিভ্রম ঘটিয়েছে। তাই তিনি চারুদত্ত-শর্বিলক চরিত্রের আলোচনায় নির্দ্বিধায় বলতে পারেন,'চারুদত্ত ভারতীয় আর্য, শর্বিলক ইউরোপীয় আর্য, চারুদত্ত সাত্ত্বিক, শর্বিলক রাজসিক অর্থাৎ 'প্রাগম্যাটিক।' তারপরেই অদ্ভুত সরলীকরণ: 'স্বৈরভাব ইউরোপীয়ের চক্ষে সত্ত্বগুণের আদর অল্প, রজোগুণের সমাদর অধিক। একজন ইউরোপীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারের মতে মহাভারতের নায়ক যুধিষ্ঠির নহেন। উহার নায়ক অর্জুন। সেইরূপ ইউরোপীয় আলংকারিকদের চক্ষে মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত না হইয়া শর্বিলক হইলেই ভাল হইত।' বলা বাহুল্য, এই উক্তি সাহিত্য-সমালোচনা নয়। মনস্তত্ত্ব বা সমাজবিশ্লেষণও নয়, এখানে লেখকের 'জাতিবৈর' প্রকাশ পেয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। লেখক বর্ণাশ্রম প্রথার পক্ষপাতী, এ বিষয়ে আমরা 'সমাজচিন্তা' শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু

'সামাজিক প্রবন্ধে লেখকের দৃষ্টি অনেক সংস্কারমুক্ত। বিবিধ প্রবন্ধে, বিশেষত মৃচ্ছকটিকে লেখকের সংস্কার সমধিক প্রকট। এমন কি গণিকাবৃত্তিকে একটা সঙ্গত বৃত্তিরূপে দেখে তিনি বর্ণভেদ প্রথার পক্ষে এটিকে অপরিহার্য মনে করেছেন। গ্রীস রোম, মিশরেও গণিকাবৃত্তি ছিল, গণিকালয়গুলির সঙ্গে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি যুক্ত ছিলেন। তারপরে তিনি বলেছেন, 'গণিকার একপ গৌরব এবং সমাদর বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় নহে।' রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রমুখের নারীমুক্তি আন্দোলন, স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের পর হিন্দু কলেজের ছাত্র, মধুসূদন রাজনারায়ণের সহপাঠী ভূদেব অন্তত 'নীনাসা' বসন্তসেনার বৃত্তি-বিরোধিতার মধ্যে সংগুপ্ত প্রেমিকা হৃদয়ের গাঢ় অনুরাগের নির্মলতা লক্ষ্য করতে পারতেন। ভূদেব লক্ষ করুন বা না করুন শূদ্রক অন্তত বসন্তসেনা চরিত্রে ঐ বৃত্তির বিরুদ্ধেই বিক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। 'গুণশস্ত্র'-বীর 'ভূতল মৃগাংক,' 'ভৃত্যানুকম্পক' চারুদত্ত প্রেমিকও, চারুদত্ত সন্দা। তাই শত্রুকে (শ্যালক) তিনি উপকার-ছল করতে আগ্রহী। সুতরাং হিন্দুর বর্ণভেদ প্রথা তথা গণিকা-কন্যার মাতৃবৃত্তির পক্ষে মোটেই শূদ্রকের রায় প্রকাশ পায় নি। সংস্কৃত নাট্যধারায় মৃচ্ছকটিক যে ব্যতিক্রম—নির্জিত নারী-হৃদয়ের রক্তক্ষরণে এবং তপ্ত অশ্রু বিসর্জনে তার যে বেদনাময় উজ্জ্বল প্রকাশ পেয়েছে— সদিকে ভূদেবের দৃষ্টি পড়েনি।

শিক্ষা-চিন্তা

ভূদেব আজীবন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। বস্তুত হিন্দু কলেজে পড়বার সময় 'স্ত্রীশিক্ষা' বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে যেদিন (১৮৪২) দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন, সেদিনই তাঁর শিক্ষা-চিন্তার সূচনা। ১৮৪৫ সালে হিন্দু কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে বেরিয়ে তিনি ১৮৪৬ সালেই হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে বৃত হন। রাধাকান্ত দেব—হরিমোহন সেন—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় এক বছর পরে পদত্যাগ করেন। তিনি নিজেই ফরাসী চন্দননগরে ১৮৪৭ সালে চন্দননগর সেমিনারি নামে একটি স্কুল স্থাপনা করেন। নিজের শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ তিনি প্রথম এখানেই পেয়েছিলেন। কিন্তু পরের বছরে আর্থিক কারণে তিনি ঐ স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

তারপরেই সরকারী শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ এবং বিভিন্ন সময়ে নানা দায়িত্বশীল পদ অলংকৃত করেন। ১৮৫৬ থেকে ১৮৮৩ সাল—একটানা ৩৮ বছর তিনি আমাদের স্কুল পর্যায়ে পঠন-পাঠনার সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। কেবল বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নয়, তিনি বিহার ও আসামের শিক্ষা বিস্তারেও যথেষ্ট আন্তরিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিহারে হিন্দীভাষা এবং আসামে অসমীয়া ভাষার মর্যাদা তিনি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৮৩৪ সালে বাংলাদেশে ইংরেজির বদলে বাংলা আদালতের ভাষারূপে গৃহীত হয়। সেই দৃষ্টান্তে তিনি বিহারে হিন্দী এবং আসামে অসমীয়াকে আদালতের ভাষারূপে গ্রহণের প্রস্তাব দেন। সে প্রস্তাব পরবর্তী কালে গৃহীত হয়েছিল। বোধহয় ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে ভূদেবই প্রথম সাঁওতালদের শিক্ষার কথা ভেবেছেন। এবং তাঁর মতে সে শিক্ষা সাঁওতালী ভাষাতেই হওয়া উচিত। ক্রফট এ প্রস্তাবে দ্বিধান্বিত এবং বীমস্ বিরোধী ছিলেন বলে ভূদেবের প্রস্তাব সফল হতে পারেনি।

পূর্বেই বলা হয়েছে, বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-চিন্তার সঙ্গে ভূদেবের শিক্ষা-চিন্তার অনেক মিল আছে। এই দুজন মনীষীই নিছক শিক্ষা বিভাগের চাকুরীজীবী ছিলেন না, দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য তাঁরা যে ভাবনা-চিন্তা করেছেন, চাকুরিসূত্রে সেগুলি বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন।

বিদ্যাসাগর শিক্ষা বিভাগের কর্তা জি· টি· মার্শাল-কে নানা সময়ে অনেক পরামর্শ দেন। আলফ্রেড ক্রফ্‌ট সাহেবও ভূদেবের মতামতকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন। রসময় দত্তের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এবং ক্যামবেলের সঙ্গে ভূদেবের মতবিরোধ একই কারণে হয়েছিল ; নিজেদের মৌলিক শিক্ষা-চিন্তাই আপোষের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কেবল সরকারী শিক্ষা বিভাগের রিপোর্টে বা প্রস্তাবে ভূদেবের শিক্ষানীতি সীমাবদ্ধ ছিল না। নিজের শিক্ষা-চিন্তা অনুযায়ী তিনি ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক বই লেখেন, রামগতি ন্যায়রত্ন, পদ্মনাথ বিদ্যানিধি, শিবনারায়ণ ত্রিবেদী, ছটুরাম তেওয়ারী প্রমুখ শিক্ষকদের উপযুক্ত পাঠ্য বই লেখায় উৎসাহিত করেন।

ভূদেবের পাঠ্য বইগুলি তাঁর শিক্ষা-চিন্তারই সাক্ষ্যবহ।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। প্রথম ভাগ। (জড়ের গুণ, গতির নিয়ম, ভারসাম্য)। (১৮৫৮)

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। দ্বিতীয় ভাগ। (যন্ত্র বিজ্ঞান ও বাষ্পীয় যন্ত্র)। (১৮৫৯)

ক্ষেত্র তত্ত্ব। ইউক্লিডের প্রথম তিন অধ্যায়। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের অনূদিত ইউক্লিডের জ্যামিতি, অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা ও টীকা সমেত—ছাত্রদের উপযোগী সংস্করণ। (১৮৬২)

ইতিহাসের বইগুলি ইংরজি প্রামাণ্য ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত। কোনটিই নিছক অনুবাদ নয়। পুরাবৃত্তসার (১৮৫৮) প্রাচীন মিশরীয় রোমীয় ও পারসীক সভ্যতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। লেখকের জীবদ্দশায় বইটির চোদ্দটি সংস্করণ হয়। এ ছাড়া রোমের ইতিহাস (১৮৬৩), ইংলণ্ডের (১৮৬২) বাঙ্গালার ইতিহাস (৩য় ভাগ ১৮৯০)—বইগুলিও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রত্যেকটি বইয়েরই একাধিক সংস্করণ মুদ্রিত হয়। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' বইতে যথাক্রমে স্যার চার্লস মেটকাফ, লর্ড অকলণ্ড, লর্ড এলেনবরা, লর্ড হার্ডিং, লর্ড ডালহৌসি, লর্ড ক্যানিং—স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট, লর্ড এলগিন—স্যার সিসিল বীডন, স্যার জন লরেন্স বীডন—এই আটটি অধ্যায় এবং 'বঙ্গদেশের ভৌগোলিক বিবরণ' নামে পরিশিষ্ট আছে। অবশ্যই তৎকালীন সরকারী নথিপত্র থেকে ভূদেব সাহায্য পেয়েছিলেন। তবু ইংরেজ আমলের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে চার্লস মেটকাফের সঙ্গে ডালহৌসি প্রশাসনের পার্থক্য নির্ণয় লেখকের নিজস্ব ইতিহাস ভাবনার পরিচায়ক।

তিনখণ্ড ভূদেব চরিতের বিক্ষিপ্ত উপকরণ থেকে শিক্ষা বিষয়ে চিন্তানায়ক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের চিন্তা ও কর্মধারার নিম্নরূপ বিবরণী সংকলন করা যায়।

স্কুল ইনস্পেকটর কর্মরত থাকার সময় ১৮৬২, ১৮৬৩, ১৮৬৪, ১৮৬৫ সালে তিনি যে বিশদ 'রিপোর্ট' দাখিল করেন, সেগুলি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কারণ সেগুলি গতানুগতিক কার্যবিবরণ নয়, শিক্ষার বর্তমান অবস্থা এবং তার উন্নতি বিষয়ে প্রায়ই তিনি গঠনমূলক প্রস্তাব ও মন্তব্য জুড়ে দিতেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে ভূদেবের উদ্যোগে বাংলা বিহার উড়িষ্যায় ১০১টি মডেল স্কুল খোলা হয়। ১৮৭৬ সালে 'সেক্রেটারি অফ স্টেট' নর্মাল স্কুলের শিক্ষণ ব্যবস্থা বিষয়ে একটি বিস্তৃত বিবরণ ইংলণ্ডে পাঠান। তাতে এই ব্যাপারে ভূদেবের চিন্তা ও কর্মকুশলতার উল্লেখ আছে :

I have perused with much interest the report of Babu Bhoodeb Mukherjee, the Inspecter specially appointed to superintend the working of this system and have been much gratified at that officer's zeal and intelligence and the correct comprehension manifested in his report of the paogress of the govt. in the establishment of the system.

১৮৬২ সালে বাংলা সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারিকে লেখা (১৬ই ডিসেম্বর ১৮৬২) চিঠিতেও ভূদেবের সম্বন্ধে একটি প্রশংসা-সূচক অনুচ্ছেদ আছে।

বর্ধমান, কৃষ্ণনগর ও যশোর জেলায় ১৮৬২-৬৩ সালে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগ হয়। ভূদেবই যেহেতু নর্মাল স্কুল ব্যবস্থায় বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের যোগ্যতম উত্তরসাধক, তাই সরকার তাঁকেই অধ্যক্ষ নির্বাচনের দায়িত্ব দেন। তিনি উক্ত পদের জন্য যথাক্রমে বর্ধমানে রামগতি ন্যায়রত্নকে (২।১২।১৮৬২) কৃষ্ণনগরে নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণকে (১৫।১।১৮৬২) এবং যশোরে সীতানাথ তর্কালংকারকে (২৭।১।১৮৬৩) নির্বাচিত করেন।

৩.৩.৭৭ তারিখের ডায়েরিতে আছে : 'নর্মাল স্কুলের ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি তৈয়ারি করিলাম।' আবার ১০.৩.৭৭ তারিখে তিনি লিখেছেন—'ছোটলাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। শিক্ষাসংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয়েও তাঁহাকে পত্রাদি লিখিতে আপনা হইতেই বলিলেন এবং তাহাতে তাঁহার সাহায্য হইবে জানাইলেন। শিক্ষাবিভাগের উপযুক্ত বাঙালী কর্মচারীদের নামের একটা তালিকা দিতে বলিলেন।'

৭.৪.৭৭ : 'ক্যাম্বল সাহেব কৃত শিক্ষা বিভাগ সমূহের এবং তাহাদের কিঞ্চিৎ সংস্কার জন্য সার রিচার্ড টেম্পলের চেষ্টার সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া শিক্ষা

বিভাগের উন্নতিসাধন সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব সটক্লিফকে (সার জন সাটক্লিফ) লিখিলাম।'

উনিশের শতকের সাতের দশকে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়নির্বাহের জন্য জমির ওপর শিক্ষা-সেস ধার্য করার প্রস্তাব ওঠে। বাংলাদেশে এই 'সেস' প্রবর্তনের পূর্বেই অন্যান্য প্রদেশে অনুরূপ সেস চালু হওয়ায় পাঠশালাগুলির অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার মোটেই উন্নতি হয় নি। অভিজ্ঞ স্কুল-ইনস্পেকটর রূপে সে-বিষয়ে তথ্যনির্ভর চিত্র তাঁর চোখের সামনে ছিল। তাই তাঁর মনে হয়েছে সেস-পদ্ধতি ভালো নয়। এ সম্পর্কে তিনি বাংলার ছোটলাট স্যার এ্যাশলে ইডেনকে একটি পত্র লেখেন (১৯.২.৮২)। তার সারমর্ম :

> 'আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষাকরের প্রবর্তনের সহিত এইরূপ প্রাচীন স্বতঃউৎপন্ন (***Indigenous***) পাঠশালাগুলি উঠিয়া গিয়াছে। করের সাহায্যে স্থাপিত পাঠশালাগুলি অপেক্ষা সংখ্যাতেও অল্প এবং পাঠনাতেও নিকৃষ্ট।
>
> বঙ্গদেশে শিক্ষাকর নাই। এখানে প্রাচীন দেশীয় পাঠশালাগুলি এখনও সজীব এবং সমাজের নিম্নস্তরে জনসাধারণের শিক্ষার অভাব পরিপূরণ করিতেছে। এ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে ভূমির উপর শিক্ষা-কর সংস্থাপনের প্রস্তাব পরিত্যাগ করাই উচিত।
>
> প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আমার নিজের একটি প্রস্তাব আছে। আমার ইচ্ছা করে যে আপনার অনুমতি লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ-সম্বন্ধে একটা আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করি। উহা অনেকটা ১৮৭০ সালের ৬ আইনের সদৃশ হইবে।'

এ সম্পর্কে তাঁর খসড়া বিবরণী শিক্ষা বিভাগের কর্তা ক্রফটের অনুমোদনও লাভ করেছিল। পুরনো পাঠশালা-ব্যবস্থা এবং নর্মাল স্কুলের সহযোগে কিভাবে গ্রামীণ বাংলার শিক্ষা-চিত্র বদলে দেওয়া যেতে পারে, সে বিষয়ে হাণ্টার কমিশনের প্রাদেশিক সদস্যরূপে তাঁর সমগ্র বিবরণী অত্যন্ত মূল্যবান।

সাময়িক পত্র পরিচালনেও সেই শিক্ষাব্রতী ভূদেবেরই অন্য পরিচয় পাই। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করলেই লেখকের উদ্দেশ্য বোঝা যাবে।

'পল্লীগ্রামের লোকেরা কোন ভাল বিষয়ের কথা শুনিতে পারেন না—তাঁহাদের মধ্যে কেবল দলাদলির আর নিমন্ত্রণের কথাই হইয়া থাকে—অতএব প্রামাণিক সংবাদপত্র সমস্ত হইতে ফলোপধায়ক ও শুশ্রূষাজনক কতকগুলি

কতকগুলি করিয়া সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলে তাদৃশ লোকদিগের অনেক উপকার দর্শিতে পারে, সংবাদগুলি কিছু পুরাতন কিন্তু নিতান্ত উপবাসক্লিষ্ট ব্যক্তিকে পর্য্যুষিতান্ন প্রদান করিলেও পুণ্য আছে। আর দেখ, যে সকল আইন প্রচলিত আছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রস্তাবিত ও প্রচলিত হইয়া যাইতেছে, তাহার মর্ম অনেকেই অবগত হয় না, অথচ আইন না জানায় লোকের যে দোষ হয়, আইন কিন্তু সেই দোষের দণ্ড দিতে ছাড়ে না। ফলতঃ শিক্ষা শব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করিয়া লইলে শিক্ষা দর্পণের মধ্যে লিখা যাইতে না পারে এমন কথাই নাই। জর্মন দেশীয় একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন যে, শিক্ষাগ্রহণ করাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য, মনুষ্য দেহধারণের আর দ্বিতীয় প্রয়োজন নাই।'

দেশের সাধারণ মানুষের কাছে চলতি দুনিয়ার শিক্ষণীয় সংবাদগুলি ব্যাখ্যাসহ পরিবেশনের দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল। সাংবাদিকতা নয়, এখানেও তাঁর কাজ শিক্ষকতা। শিক্ষাদর্পণে জনশিক্ষা-বিস্তার এবং ইনস্পেক্টর রূপে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে—ভূদেবের শিক্ষাচিন্তার সম্পূর্ণ ছবিটি ফুটে ওঠে।

শিক্ষা দুই শ্রেণীর—অর্থকরী বা পাশ্চাত্ত্য আধুনিক বিদ্যা এবং পারিবারিক গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষা অর্থাৎ সনাতন ভারতীয় আদর্শের রীতি-নীতি পালন। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার ক্ষেত্রেই তিনি শিক্ষণ পদ্ধতির কথা ভেবেছেন। সনাতন ভারতীয় শিক্ষা পারিবারিক ঐতিহ্য ধারায় স্বতঃবাহিত—গুরুজনবর্গই তার শিক্ষক। 'শিক্ষাবিধায়ক' গ্রন্থে প্রথম শিক্ষা পদ্ধতির কথা আছে। 'শিক্ষাদর্পণে' যার সূচনা, 'শিক্ষাবিধায়কে' তার পরিণতি।

'শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব' থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করলেই শিক্ষা-সংস্কারক ভূদেবের শিক্ষাচিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

১০ সেকালের পাঠশালা-স্তরে শিক্ষার দূরবস্থা

'ঐ সকল পাঠশালায় এক্ষণে বিদ্যাশিক্ষা উত্তম হয় না। বহুকালাবধি ভিন্নজাতীয় রাজাদিগের এতদ্দেশীয় বিদ্যার প্রতি বিরাগ থাকাতে ঐ সকল বিদ্যালয়ের অধ্যাপনাকার্য অতি অকর্মণ্য লোকের হস্তগত হইয়াছে। পদার্থ-বিদ্যা দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি প্রধান বিদ্যার কথা দূরে থাকুক, উহারা মাতৃজাতীয় বঙ্গভাষা শিক্ষা করাইতেও অক্ষম, আর তাঁহারা যে অংকবিদ্যার গৌরব করিয়া থাকেন, তাহাও কদাচিৎ 'কড়ি কষায়' উর্ধে উঠে না। কোন দরিদ্র কায়স্থ সন্তান মুহুরীগিরি গোমস্তাগিরি প্রভৃতি কর্মকার্যে অশক্ত হইলেই পরিশেষে একটি পাঠশালা খুলিয়া গুরুমহাশয় হইয়া বসেন : কে না জানে যে, দীনহীন ব্রাহ্মণ-

কুমারদের যজমান যাজন প্রভৃতি জীবনোপায় কোথাও কিছু না জুটিলেই অবশেষে তাঁহারা গুরুমহাশয়ের বৃত্তি অবলম্বন করেন।'

২. শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্য

'বিশ্বপিতা কত আশ্চর্য নিয়ম সংস্থাপন দ্বারা স্ব-সৃষ্ট সংসার প্রতিপালন করিতেছেন, তাহার কিছুমাত্রও অবগত হয় না—এই সকল ক্ষমতা এবং জ্ঞানের উৎপাদন করাই শিক্ষা প্রণালী সংশোধনের একমাত্র তাৎপর্য।'

৩. কেতাবী বিদ্যার ত্রুটি

'অস্মদ-দেশে গ্রন্থ অভ্যাস করার নামই বিদ্যা হইযাছে। অতএব যে সকল অধ্যাপক স্বীয কার্যে একান্ত অনুরক্ত তাঁহারাই ঐ ভ্রমপ্রযুক্ত সাধারণ শিক্ষকদিগের অপেক্ষা বিশিষ্ট মনোযোগী হইযা শিশুগণকে অতিরিক্ত গ্রন্থ অভ্যাস করাইতে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু বস্তুত গ্রন্থ অভ্যাস করার নামই বিদ্যাশিক্ষা নহে। যাহাতে উহাদিগের (শিশুদিগের) বুদ্ধির স্ফূর্তি হয় এমত যত্ন করাই বিধেয।...যেমন ইন্ধন সংযোগ অগ্নিপ্রজ্জ্বালনের এবং বারিসেচন উদ্ভিদ সম্বর্দ্ধনের, তেমন পুস্তক পাঠও বুদ্ধিবিকাশের এক অসাধারণ উপায।'

৪. আদর্শ শিক্ষা প্রণালী : আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা

'তাহারা (শিশুরা) প্রত্যহ যাহা পাঠ করে, তাহা যেন উত্তমরূপে বুঝে এবং আপনাদিগের ক্রীড়াকলাপের সহিত মিলাইতে পারে। সকল বালকের বুদ্ধি সমান নয, সকলের স্মৃতিশক্তিও এক প্রকার নয। এইজন্য শিক্ষকদিগের কর্তব্য, এক অভিপ্রায নানা প্রকারে ব্যক্ত করিতে শেখানো। কিন্তু পূর্বেই কহিযাছি, শিশুদিগকে এমন করিযা শিক্ষা দেওযা উচিত, যাহাতে তাহাদিগের প্রাকৃতিক বুদ্ধি বিকল বা খর্ব না হয। যে প্রশ্নে বালকের ভ্রম হইয়াছিল, তাহা পুনর্বার এমন করিয়া জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য যাহাতে ঐ ভ্রম আপনা হইতেই দূর হয।'

৫. বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা

'বালকদিগকে নির্বোধ বলিয়া তিরস্কার বা উপেক্ষা করা বিধেয় নহে। আর যদি তাহারা নির্বোধই হয়, তথাপি তাহাদিগের বুদ্ধি স্ফূর্তি করিবার জন্যই তাহারা আমাদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, অতএব বিরক্ত হইলে অবশ্য কর্তব্যের অন্যথাভাব হয়।'

শিক্ষণ পদ্ধতি প্রসঙ্গে

'পেস্টালোজ্জাই নামক কোন সুবিখ্যাত শিক্ষাশাস্ত্রকার কহেন, বালকসকলকে কৌশলক্রমে বিদ্যার্থী করিবার যত্ন করা বিধেয়। বিদ্যাভ্যাস করাইবার

নিমিত্ত ভয় প্রদর্শনাদি রুক্ষ উপায় অবলম্বন করা বিহিত নহে। রিখটর নামক অপর কোন মহামহোপাধ্যায় কহিয়াছেন যে, শিশুদিগের মনেও কর্তব্যাকর্তব্য-বোধ জন্মাইবার চেষ্টা করা আবশ্যক। অতএব সর্বদা ছলে বলে কৌশলে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার চেষ্টা করা বিহিত নহে। এই পাঠাভ্যাসটি তোমার অবশ্য কর্তব্য, অতএব তোমাকে করিতে হইবে, এইরূপ অনুজ্ঞা দ্বারা বিদ্যার্থী-দিগকে বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করা সুযুক্তিসিদ্ধ।'

ভূদেবের মতে বাল্যশিক্ষার একেবারে প্রথম পর্যায়ে শিশুশ্রেণীতে (প্রি-প্রাইমারি বা কিণ্ডারগার্টেন পর্যায়) পেস্তালৎসির নির্দেশই শ্রেয়। চঞ্চল শৈশবকে খেলাচ্ছলে আনন্দের মাধ্যমে, অনেক সময় 'দর্শনীয় মাধ্যম' (অডিও-ভিস্যুয়াল) প্রয়োগ করে পড়াশোনায় আগ্রহী করা ভালো। তাতে প্রাথমিক শিক্ষা নীরস হয় না, অথচ বহু বিষয়ে ঔৎসুক্য বাড়ে। শিক্ষককে ছাত্ররা আনন্দের সঙ্গী মনে করে। সুতরাং বিদ্যালয় আনন্দনিকেতন হয়ে দাঁড়ায়, ভয়ের জায়গা নয়। কিন্তু ভূদেবের মতে, শিশু কয়েক বছর অতিক্রম করলে ঐ পদ্ধতি ত্যাগ করা উচিত। নতুবা জ্ঞানচর্চার উপযোগী মানসিক প্রস্তুতি গড়ে উঠবে না। প্রত্যেক মানুষেরই কিছু করণীয় এবং কিছু অ-কর্তব্য থাকে। ছাত্রের তপস্যা অর্থাৎ কষ্টের সাধনা হল পড়াশোনা। শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ রিখটর সেদিকে জোর দিয়েছেন। পরিণত বাল্যকাল থেকেই এই শিক্ষণ-পদ্ধতি মান্য হওয়া উচিত।

কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা, শিক্ষকদের জীবনাচরণ। ছাত্রদের কাছে তাঁরা হবেন সব ব্যাপারে আদর্শ, অনুকরণযোগ্য।

'শিক্ষক, শিষ্যবর্গের সম্পূর্ণ প্রীতি, ভক্তি ও বিশ্বাসভাজন না হইলে এই উভয় উপায়ের কিছুই কোন কার্যকরী হয় না।'

৭. সেনেকা লক ও ফ্রাঙ্কলিন প্রসঙ্গে

এই তিনজনেই ব্যবহারিক শিক্ষার পক্ষপাতী। প্রাত্যহিক খরচের খাতা রাখার অভ্যাসকে ভূদেব নিজে খুব গুরুত্ব দিতেন। নিজেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজের হাতে হিসাবের খাতা লিখতেন। তাঁর দিনলিপির মধ্যেও হিসাব এবং সাংসারিক বহু তুচ্ছ জিনিসের বিবরণ আছে। যথার্থ শিক্ষকের কাছে কোন কিছুই তুচ্ছ নয়। তাই 'বাল্যাবধি সময়ের মিতব্যয়িতার শিক্ষাপ্রদান করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সেনেকা, লক এবং ফ্রাঙ্কলিন ইহারা সকলেই একমত হইয়া এই প্রকার বহি প্রস্তুত করিয়া রাখিবার বিধি দিয়াছেন। বিশেষতঃ শেষোক্ত মহানুভব স্বয়ং কৃতকর্মা হইয়া ইহার গুণ বুঝিয়াছিলেন।'

৮. জীবন গ্রন্থাগারের চেয়ে বড়

বই জ্ঞানের আকর। হাজার হাজার বছরের চিন্তার ও কল্পনার ফসল গ্রন্থাকারে বিধৃত। তবু গ্রন্থপাণ্ডিত্যে মানব জীবনের সব অভাব পূরণ হয় না। জীবনই সবচেয়ে বড় শিক্ষানিকেতন। চোখ-মন খোলা রেখেই শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়।

'অনেকে পুস্তক না পড়িয়াও কৃতকর্মা এবং বিচক্ষণ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মনুষ্য বিরচিত গ্রন্থ অপেক্ষা পরমেশ্বর প্রণীত এই জগন্মণ্ডল অতি উৎকৃষ্টতর (?) গ্রন্থ।'

৯. শিক্ষকদের প্রতি নির্দেশ

শিক্ষকতা অন্য যে-কোন পেশার বিকল্প হতে পারে না। অন্য চাকরি না পেয়ে শিক্ষক-বৃত্তি গ্রহণ করলে শিক্ষক নিজেও সুখী হতে পারেন না এবং ছাত্রদেরও তাঁর পক্ষে যথোচিত অনুপ্রাণিত করে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে ভূদেবের বক্তব্য: 'আপনাদিগের এই বিবেচনা করা কর্তব্য যে আপনারা কি কেবল বিত্ত লাভের জন্য সে শিক্ষকতা কার্য গ্রহণ করিয়াছেন? অথবা অন্য কোন কর্ম অপেক্ষা ইহাতে সন্তোষ অধিক বলিয়া এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? যদি অর্থপ্রয়াসে আসিয়া থাকেন, তবে শীঘ্র এই কর্ম পরিত্যাগ করিয়া উপায়ান্তর অনুসন্ধান করুন। যেহেতু শিক্ষকের কর্মে যথা-কথঞ্চিৎ রূপেও ধনাশা পরিপূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

১০. আদর্শ শিক্ষক প্রসঙ্গে

'শিশুগণের প্রণয়ভাজন না হইলে তাহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা সম্পন্ন করানো যায় না, ইহা জানিয়া আপনাদিগের আমোদ-প্রমোদও তাদৃশ বিশুদ্ধ করিবেন—এইরূপ স্বীয় কার্যের প্রতি অনুরাগ থাকিলেই আপনাদিগের মন বিশদ, বুদ্ধি পরিষ্কৃত, বিদ্যা প্রমাদশূন্য, আমোদ অনিন্দ্রিয়পর হইবে। এই সকল গুণ উপস্থিত হইলে সুখেরই বা অভাব কি?'

১১. জ্ঞানবৃদ্ধি ও ব্যবহারিক প্রয়োগের সমন্বয় প্রসঙ্গে

'দেহযাত্রা নির্বাহের সাহায্যার্থ অতি শীঘ্রই তাহাদিগকে (ছাত্রদের) বিষয়কার্যে ব্যাপৃত করিতে হইবে। অতএব অধ্যাপকবর্গ! তোমরা স্বয়ং ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র হও বা কেবল সংস্কৃত শাস্ত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাক, যদি পাঠাবস্থার পর বিষয়জ্ঞানের বৃদ্ধি না করিয়া থাক, তবে এক্ষণে যে-কর্মে প্রবৃত্ত হইতেছ, সর্বতোভাবে তাহার যোগ্য হও নাই।

বিষয়জ্ঞান বিস্তারের আর এক প্রধান ফল এই যে তদ্দারা বাহ্যবস্তুর পরীক্ষার অভিরুচি জন্মে।'

বস্তুত এদেশে শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ে পঠনপাঠন শুরু হবার বহু পূর্বে লেখা ভূদেবের 'শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব'-ই বাংলাভাষায় প্রথম শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষণ সমস্যার বই। বইটির মূল্য আজও কমেনি।

তবে তাঁর অন্যান্য রচনায়—যেখানে সরাসরি শিক্ষাপ্রসঙ্গ তাঁর আলোচ্য বিষয় নয়, সেখানেও তাঁর শিক্ষা-চিন্তার কোন কোন দিক প্রতিফলিত হয়েছে। পারিবারিক প্রবন্ধ ও সামাজিক প্রবন্ধ থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে আলোচিত হতে পারে।

'সন্তান-সন্ততিকে লেখাপড়া শিখাইতে হয়, এই বোধটি এখনকার প্রায় সকল লোকেরই মনে জাগরূক হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বেও যে দেশে ঐরূপ বোধ ছিল না কিংবা এখনকার অপেক্ষা কম ছিল, তাহা নহে। তবে পূর্বেকার গতানুগতিক ঐ বোধ অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রখর ছিল, এক্ষণে স্বচিন্তা বা উদরচিন্তা অথবা অভিনয় শিক্ষা দ্বারা প্রণোদিত নব্যদিগের ঐ বোধটি অপেক্ষাকৃত প্রখর এবং সতেজ হইয়াছে। পূর্বকার ব্যবস্থা পাঁচ বৎসরের ছেলের হাতে-খড়ি দাও, তাহাকে পাঠশালায় পাঠাও—পাঠ অভ্যাস করাও—না করে 'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ' বচনার্থ স্মরণ করিয়া যাহা করিতে হয় কর। যাহা করা উচিত সন্তানকে বলিয়া দাও—যাহা না করা উচিত তাহাও বলিয়া দাও—বুঝাইবার প্রয়োজন নাই—উচিত না করিলে মার—অনুচিত করিলে মার। তাহা করিলেই শিক্ষানীতির পদ্ধতির কোন এবং তাহার মুখ্য অনুষ্ঠান হইল।'

শিক্ষাভিত্তি। পারিবারিক প্রবন্ধ

দুটি পদ্ধতি—এক· ঠেকে শেখা বা ভূয়োদর্শন দ্বারা শিক্ষা, দুই· বিধি ও নিষেধ মুখে শিক্ষা। ভূদেব দুই পদ্ধতির মূল্যই স্বীকার করেন। তবে শিশুদের পক্ষে দ্বিতীয় পন্থাই শ্রেয়।

'সন্তানের শিক্ষা' আর-একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এত গভীরভাবে এবং মৌলিকভাবে বাঙালী ছেলেমেয়েদের শিক্ষাসমস্যার কথা তাঁর পূর্বে কেউ ভাবেন নি।* বাঙালী সমাজের দোষ-ত্রুটি মোচনের লক্ষ্য মনে রেখেই বাঙালী শিক্ষার্থীদের শিক্ষানীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত। ভূদেব দশটি সূত্রে তাঁর বক্তব্য নিবদ্ধ করেছেন। যথা: (১) শারীরদৌর্বল্য মোচনে ব্যায়ামচর্চা,*

*ব্যায়ামচর্চা—সন্তানজনন। জন্মশাসন। ছেলেমেয়েদের সেক্স এডুকেশন বিষয়েও ভূদেব আগ্রহী ছিলেন।

(২) দূরতা, নৈকট্য, সংখ্যা, ভাব প্রভৃতি বিষয়ে ইন্দ্রিয়শিক্ষা, (৩) স্মৃতিশক্তির অপব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা ; (৪) কল্পনা-প্রবণতা তথা অনৃতবাদিতা—এই দোষমোচনে যত্ন, (৫) উচ্চাশার অভাব—উচ্চাশার জাগরণ, (৬) শ্রমশীলতা শিক্ষা, (৭) প্রতিযোগিতার ভাবোদ্রেক, (৮) অযথা অনুকরণ বৃত্তি, পাশ্চাত্ত্যানুকরণ-মোচনের প্রয়াস, দেশীয় ঐতিহ্যবোধের সঞ্চার, (৯) স্ব-সমাজের প্রতি সহানুভূতি, (১০) পান-ভোজন নৃত্য গীতের বিলাসিতা বর্জন।

সূত্রগুলি নিছক নীতি-উপদেশের মত বিবৃত হয়নি। সহজ আটপৌরে কথালাপের ভঙ্গিতে দৃষ্টান্তযোগে উপস্থিত করা হয়েছে। এবং ভূদেবের সারকথা—দেশের প্রতি, নিজের সমাজের প্রতি, পিতা মাতার প্রতি 'ভক্তিমূলক বশ্যতা।' তিনি সর্ব-দেশ-কালের নির্বিশেষ শিক্ষায় বিশ্বাসী নন। ছেলে 'মানুষ' করার অর্থ হল নিজের পরিবার ও দেশীয় সমাজের যোগ্য করে তোলা। সুতরাং পশ্চিমের অনুকরণ এখানে সুফলপ্রসূ হতে পারে না।

ভূদেবের মতে—'তবে যে সাধারণ মনুষ্যধর্মগুলি সকল জাতিতেই বিদ্যমান আছে, জাত্যনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করিতে করিতে সেই সকল ধর্ম সর্বজাতীয় মনুষ্যশিশুরই শিক্ষা হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।'

'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধটিও এই সূত্রে স্মরণীয়। 'সমাজচিন্তা' শীর্ষকে প্রবন্ধটির পর্যালোচনা আছে, তাই এখানে উল্লেখ করা হল মাত্র। 'স্ত্রীশিক্ষা' বলতে তিনি স্কুল-কলেজের শিক্ষা বোঝাতে চান নি। 'লোকে আপনাপন পরিণীতা ভার্যাকে কিরূপ শিক্ষাপ্রদানের চেষ্টা করিবেন'—সে বিষয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পারিবারিক মূল্যবোধের শিক্ষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে কঠিন দায়িত্ব ভর্তারও।

এখানে তিনিই স্ত্রীর শিক্ষাগুরু। শিক্ষণীয় মূল্যবোধে তাঁকেও স্বয়ং-সিদ্ধ হতে হবে।

সামাজিক প্রবন্ধের 'কর্তব্য নির্ণয়—সূত্রের প্রয়োগ' অংশ থেকে ভূদেবের সমগ্র শিক্ষা-পরিকল্পনার একটি খসড়া উপস্থিত করা যেতে পারে।

'ইংরাজের অধিকারে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে বলিয়াই লোকের সংস্কার। কিন্তু ঐ সংস্কারটি সম্যক্ ভ্রমশূন্য বলিয়া বোধ হয় না। শিক্ষা দুই প্রকারের। এক, প্রাথমিক শিক্ষা, অপর উচ্চশিক্ষা ; তন্মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত কথা এই যে, এ দেশে বহু পূর্বকাল হইতে যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন ছিল, উহা এখন তাহা হইতে পাদমাত্র অগ্রসর হয় নাই। পূর্বে যে শ্রেণীর লোকেরা পাঠশালায় ছেলে পাঠাইত, এখনও সেই শ্রেণীর লোকেরাই পাঠায়, তদ্ভিন্ন

শ্রেণীর লোকেরা এখনও ছেলে পাঠায় না। ইংরাজদিগের স্বদেশে প্রাথমিক শিক্ষাটি নিতান্তই নূতন ব্যাপার। ইংরাজেরা আপনাদিগকে সকল বিষয়েই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন। অতএব তাঁহাদের দেশে যাহা ছিল না, তাহা পূর্ব হইতেই এদেশে আছে, এ কথা উঁহাদের মনে স্থান পায় না। এই জন্যই উঁহারা আপনাদিগকে এখানকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তক, অন্ততঃ তাহার বিস্তারকর্ত্তা বলিয়া মনে করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু দেশের দারিদ্র্য-বর্দ্ধনের সহিত কি প্রাথমিক, কি উচ্চ, কোন শিক্ষারই বৃদ্ধি হয় না, প্রত্যুত সঙ্কোচই হইয়া থাকে এবং তাহাই হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা ত বিস্তারে বাড়ে নাই, গভীরতায় কিছু ন্যূন হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। কি নীতি অর্থাৎ গুরুজনে ও দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি, কি মানসাংক, কি হস্তাক্ষর, কিছুতেই এখনকার পাঠশালার ছাত্রেরা পূর্বকার পাঠশালার ছাত্রদিগের সহিত তুলনীয় নহে।

ওদেশের বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ওরূপ শিক্ষার হ্রাসবৃদ্ধিতে বর্তমান কালে ভারত-সমাজের বিশিষ্ট হিতাহিত কিছুই হইতে পারে না। যখন ইউরোপীয়দিগের কোন প্রাথমিক শিক্ষা ছিল না, তখন হইতেই উঁহারা প্রবল হইয়াছেন, আর ব্রহ্মদেশীয়দিগের মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই লিখিতে এবং পড়িতে পারে, তাহাতে ব্রহ্মদেশ, কি ধনে, কি ধর্মে, কি গৌরবে, কিছুতেই বড় হয় নাই।

এখনকার ইংরাজী উচ্চশিক্ষা দেশীয় উচ্চশিক্ষার অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছে—যেমন ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা হইতেছে, তেমনি সংস্কৃত এবং আরবী ফারসী কম হইয়া গিয়াছে। স্কুল কলেজ বাড়িয়াছে, কিন্তু টোল, চতুষ্পাঠী, আখড়া, মাদ্রাসা কমিয়াছে। তবে যে সকল শ্রেণীর মধ্যে পূর্বে উচ্চশিক্ষা ছিল না, তাহাদের মধ্যেও কতকটা ইংরাজী শিক্ষা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা করিলেও শুনিতে পাই যে এখনও সমস্ত বাঙ্গালা প্রদেশে ইংরাজীস্পৃষ্ট লোকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজারের কম। এখানে যে ইংরাজী বিদ্যার প্রচার হইয়াছে, তাহাও পূর্ণাবয়ব নহে। ইংলণ্ডের প্রাথমিক পাঠশালার ছাত্রেরা যে সকল বিষয় শিক্ষা করে, এখানকার স্কুল কলেজের উচ্চশ্রেণীগুলিতেও সে সকল বিষয় তেমন শিক্ষিত হয় না। বিজ্ঞানই ইউরোপীয় বিদ্যার সারাৎসার। এখানে সেই বিজ্ঞান বিদ্যার আলোচনা নাই বলিলেই হয়। এখানে বিজ্ঞানের গল্প শুনা হয় মাত্র। বিজ্ঞান অফল শাস্ত্র নয়। উহাতে সত্য সত্যই শিক্ষিত হইলে এতদিনে তাহার সমূহ ফল দৃষ্ট হইত। দেশে কল-কারখানা বাড়িত এবং বিজ্ঞান-শিক্ষিতেরা প্রাচীন শাস্ত্রীয়

মতবাদের এবং আচারের প্রতি সজ্ঞান-ভক্তিসম্পন্ন হইতে পারিতেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, আর্যশাস্ত্রে ভৌতিক প্রসার শক্তির এবং মনুষ্যের সাধন-চেষ্টার প্রভাব এবং অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের নিরবধিত্ব এরূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে, অপরাপর দেশের ধর্মশাস্ত্রের ন্যায় বিজ্ঞানের সহিত আর্য-শাস্ত্রের বিন্দুমাত্র বিরোধ নাই। প্রত্যুত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত অনেকানেক তথ্যের আভাস আর্যশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং বিজ্ঞান আরও অনেকদূর অগ্রগামী হইতে পারিলে তবে সমস্ত শাস্ত্রোক্ত তথ্যের নিকট পৌছতে পারিবেন।

অতএব আমরা এ-পর্যন্ত যে প্রাথমিক বা উচ্চশিক্ষা পাইতেছি তাহার দ্বারা কোন প্রকৃত শুভ ফল লাভ হয় নাই বলিলেই হয়। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর প্রভৃতি সম্পত্তির লোপ, ক্ষতি এবং অকার্যে প্রয়োগ হইয়া দেশীয় উচ্চশিক্ষার পতন হইয়াছে। দেশের শিক্ষকবর্গ তেজোহীন এবং ভিক্ষোপজীবী হইয়াছেন। উহাদিগের পুনঃ সংস্থাপনের জন্য এবং উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করাই এখনকার একটি প্রধান কর্তব্য। ভারত সমাজ রক্ষার উপযোগী অপর কোন কার্য্যই ইহার অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া বোধ হয় না। শাস্ত্রে মঠাদি প্রতিষ্ঠার যে ভূয়সী প্রশংসা আছে, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই।

উপাধ্যায়স্য যোবৃত্তিং দত্বাধ্যাপয়তি দ্বিজান্।
কিন্নদত্তং ভবেৎতেন ধর্ম্মকামার্থমিচ্ছতা॥

যে ধর্ম কাম এবং অর্থ সাধনেচ্ছুক ব্যক্তি উপাধ্যায়কে বৃত্তি দানপূর্বক দ্বিজগণকে অধ্যাপিত করেন তিনি কি না দিলেন?

ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্যা শিক্ষা করাও আমাদের অপর একটি রক্ষণোপায়। সমাজ রক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হইলে, উহা একটি প্রকৃত ধর্মকার্যই হইবে। শাস্ত্রে বিধি আছে—

শ্রদ্দধানঃ শুভা বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
.. ..
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্বতঃ।

অবরলোক হইতেও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শুভকরী বিদ্যা গ্রহণ করিবে।... সকল স্থান হইতেই বিবিধ শিল্পবিদ্যার সমানয়ন করিবে।'

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়,*১ ভূদেব ইংরেজের শিক্ষা-

***1-It was with the zeal of a missionary that he addressed himself to the task of spreading education among his**

বিভাগের মাননীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও ইংরেজদের সম্পর্কে মোহমুক্ত ছিলেন। কয়েকটি সূত্রে তাঁর বক্তব্যকে সাজানো চলে।

১. প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের দেশে অনেককালের, ইংরেজের পক্ষে নতুন। ইংরেজের নতুন প্রাথমিক শিক্ষা পুরনো পাঠশালা-ব্যবস্থার চেয়ে কিছুমাত্র উন্নত নয়।

২. প্রাথমিক শিক্ষা মাত্রেই উচ্চশিক্ষার প্রশস্ত সোপান নয়। বর্মায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপক, কিন্তু ধর্ম, নীতি, বিজ্ঞান—কোনদিকেই উন্নত নয়।

৩. ইংলণ্ডের আদর্শে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে বিশেষ ফল দর্শায় নি। খুব কম সংখ্যক লোকই ইংরেজিতে বুৎপন্ন।

৪. বরং আরবী ফারসী সংস্কৃত শিক্ষার অবনতি হয়েছে।

৫. যথার্থ বিজ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে আর্যশাস্ত্রের কোন বিরোধ নেই। এই সত্যটি প্রচার করা দরকার।

৬. আমাদের রক্ষণের উপায় 'শুভকরী' বিজ্ঞানবিদ্যা ও শিল্পবিদ্যার অনুশীলন।

---

countrymen. Bhudev was bitterly opposed to Sir George Campbell's policy of abolishing schools and colleges established earlier to provide higher education to the people. In a satire in the Education gazette (28 B. 1280) Bhudev brought out clearly how out of fear and jealousy Campbell was trying to deny higher education to the people.

ভূদেবের গদ্য রচনাশৈলী

ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'রসতীর্থ পথের পথিক' ছিলেন না, বরং তাঁকে অক্ষয় কুমার দত্তের মতো অতন্দ্র 'জ্ঞানমার্গের প্রহরী' বলাই সঙ্গত। তবু বাংলা গদ্য রচনাশৈলীর দিক থেকে সমকালের অনেক পাঠকের কাছেই অক্ষয় কুমারের গদ্যশৈলী আদর্শ এবং অনুকরণীয় বলে গণ্য হয়েছিল। অক্ষয়কুমারের তুলনায় ভূদেবের গদ্যভঙ্গি বেশ সহজ এবং অ-জটিল বাক্যবন্ধযুক্ত।

অক্ষয়কুমারের লক্ষ্য যদি হয় জ্ঞানপ্রসার, এবং বিদ্যাসাগরের সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কার, তাহলে ভূদেবের প্রধান লক্ষ্য ভারতের সমাজহিতৈষণা। তিনজনের কেউই কল্পনামুখ্য ভাবধর্মী লেখক নন। কিন্তু তিনজনের রচনাতেই ভাবুকতা প্রচুর। সমগ্র দেশ বা জাতির একটা অতীত গৌরবের আলেখ্য মনে রেখে, সংঘর্ষসংকুল বর্তমানে কিছুটা বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়েও—যাঁরা স্বদেশের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মানচিত্র মনে মনে স্বপ্ন দেখেন, তাঁরা সকলেই কম বেশি কবি ও ভাবুকের উপাদানে গড়া। সহৃদয়তা, স্বজাতিবাৎসল্য, ভাবাবেগ—সবই শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপাদান। কিন্তু কখনো কখনো কাব্যের উপাদান কর্মের আকারে বা মননের সূত্রে প্রকাশ পায়। স্মরণীয় যে অক্ষয়-কুমার 'অনঙ্গমোহন' কাব্য লিখেছিলেন, বিদ্যাসাগরের স্বরচিত সংস্কৃত কবিতাগুলি উপভোগ্য, এবং ভূদেবের রচনাংশ বিশেষ তাঁর কল্পনাপ্রবণতা ও রসমুগ্ধচিত্ততারই পরিচয়বহ।

কয়েকটি নিদর্শন উদ্ধৃত করে ভূদেবের গদ্য রচনার সাহিত্যিক উৎকর্ষ আলোচনা করা যেতে পারে।

১। 'ভারতদেশের শিরোদেশে, হিমগৌর উচ্চ উষ্ণীষের ন্যায় হিমালয় শিখর—ইহার বক্ষে ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র সদৃশ শুভ্র সলিলা স্বর্নদী—ইহার পদতল সমুদ্রের দুইটি বাহু প্রস্রুত বারিধারা দ্বারা প্রক্ষালিত—এই মহাদেশে বাস-নিবন্ধন হিন্দু জাতিদিগের মহিমা যে উচ্চ এবং উদার হইয়াছে তাহা সাধারণতঃ বলা যায়।'

এই গদ্যভঙ্গী যুক্তির সূত্রে গ্রথিত। উদার ভৌগোলিক পরিবেশ থেকেই মানসিক উদারতা এসেছে। ক্রমটি কার্যকারণ শৃঙ্খলের। কিন্তু বাক্যের প্রথমাংশের উপমা ও সমাসোক্তিতে সাহিত্যিক সৌন্দর্যের প্রকাশ।

'শিরোদেশে'—'বক্ষে'—'পদতল'—'দুইটি বাহু'—প্রয়োগে একটি উদার গম্ভীর ছবি আঁকা হয়েছে। এই ছবির রঙ ও তুলি লেখকের নিজস্ব সঞ্চয়।

২। 'বস্তুত আচার ধর্মের শরীর। দশ সংস্কার পবিত্রতার ব্যঞ্জক। ব্রতানুষ্ঠান ইন্দ্রিয় দমনের বিকাশ। আশ্রমভেদ অধিকারী ভেদ। ভেদ স্বীকৃতির পরিচায়ক এবং শ্রাদ্ধ পূজাদি পূর্বাগতদিগের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন। অতএব সমগ্র আচারলোপে নীতিলোপও অবশ্যম্ভাবী।'

এ গদ্য সাধু হলেও এতে আধুনিক চলিতের ধর্ম আছে। পুরো অনুচ্ছেদটি ক্রিয়াহীন—একটিও সমাপিকা বা অসমাপিকা নেই, একেবারে অলঙ্কার-রিক্ত। বিশেষ্য ও বিশেষণে বাক্যের সমাপ্তি। অথচ 'আচার'কে 'ধর্মের শরীর' বলায় ধর্মের সঙ্গে আচারাদির গূঢ় সম্বন্ধ ধরা পড়েছে।

৩। 'অনেকেই আমাকে কহিয়াছিল পুত্রদিগকে এত বিশ্বাস করিবেন না—আমি কহিতাম যদি আপনার পুত্রদিগকে বিশ্বাস না করিব, তবে কাহাকে করিব? আর পুত্রের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া যদি রাজ্য করিতে হয় তবে এমন রাজ্য সম্পত্তিতেই বা কাজ কি?—হায়রে! জ্যেষ্ঠপুত্র পরম বিশ্বাসভাজন দারাসীকো! তোমারই সচ্চরিত্রতা দেখিয়া আমি সকলের প্রতি সমান বিশ্বাস করিয়াছিলাম—তুমি সরলহৃদয় হইয়াছিলে, তাই পাপপূর্ণা পৃথিবীতে স্থান পাইলে না।—আমি আর কতকাল এই দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিব? রে কঠিন প্রাণ!...

আমি আপনার কর্মের ভোগই ভুগিতেছি—তবে আরঙ্গজেব নিষ্পাপ?—আমার পিতাও স্বীয় জনকের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন—তবে আমি কি জন্য অপরাধী হইলাম?—কপালের লিখন? না! না! তাহা হইলে অসৎকর্ম করিয়াছি বলিয়া কি জন্য অনুতাপাগ্নি অন্তর্দাহ করিবে?'

৭ম অধ্যায়। অঙ্গুরীয় বিনিময়।

অনুচ্ছেদটি শাজাহানের স্বগত-চিন্তা। আধুনিক উপন্যাসের মনোবিশ্লেষণী রীতির কাছাকাছি। অনেক প্রশ্ন ও বিস্ময়বোধক বাক্যের যোগফলে চরিত্রের আক্ষেপ, অনুতাপ, আত্মসমীক্ষা অস্থিরতা ফোটানো হয়েছে। ভঙ্গিটি নাট্য-গুণযুক্ত। কাহিনী বর্ণনার সাবলীল গতি প্রবন্ধের মননধর্মী ঋজু গদ্যের তুলনায় অনেক কমনীয় ও সরস।

৪। 'প্রাচীন দিল্লীর মধ্যে যে-স্থানের নাম ইন্দ্রাপত (ইন্দ্রপ্রস্থ) তাহার অনতিদূরে একটি সভামণ্ডপের মধ্যভাগে পৃথ্বীরাওয়ের আয়স-স্তম্ভ নিখাত ছিল। পূর্বে পৃথ্বীরাওয়ের প্রার্থনাক্রমে যজ্ঞবিদ ব্রাহ্মণেরা ঐ শুভ স্তম্ভ নিখাত করিয়া

বলিয়াছিলেন যে, ইহা বাস্থকীর শিরোদেশ স্পর্শ করিল—ইহার উপর যে সিংহাসন অধিষ্ঠিত হইবে, তাহা চিরকাল অচল থাকিবে। আজি আর সেই স্তম্ভ দৃষ্ট হইতেছে না, ভূমি-মধ্যে আরও বসিয়া গিয়াছে, এবং তদুপরি একটি অত্যুচ্চ দিব্য সিংহাসন প্রতিস্থাপিত রহিয়াছে। সভামণ্ডপের যে অকালজীর্ণ প্রাচীর ছিল, তাহাও আর সেরূপ নাই, সমস্ত নবীকৃত হইয়াছে।...এইস্থানেই সেই সভাগৃহ ছিল—তাহাই কি এতদিন কালতরঙ্গে মগ্ন থাকিয়া পুনর্বার ভাসিয়া উঠিয়াছে।'

—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, সাম্রাজ্যের পরিবর্তন/স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস

বর্ণনার জাঁকজমক মধুসূদনের রাবণ-সভা বা পরবর্তী ঐতিহাসিক নাটকের কোন দৃশ্যকে স্মরণ করায়। অতীত গৌরব ঘোষণার উপযোগী বর্ণাঢ্য আবেগময় সাধু গদ্যশৈলী। অনুচ্ছেদের বাতাবরণটি কল্পনার, বাক্যশৃংখলের ক্রম ঐতিহ্য-দীপিত আবেগের। এখানে কথাশিল্পীর সিদ্ধ কলমের স্বাক্ষর স্পষ্ট।

৫। 'কুরুক্ষেত্র কি শান্তরসাস্পদ স্থান! এখানে কুরুপাণ্ডব, হিন্দু-মুসলমান, শত্রুমিত্র, সকলেই এক শয্যায় শয়ান হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে—কোন বিবাদ-বিসম্বাদ বা বৈরিতার নামগন্ধও নাই। ভয়, বিদ্বেষ, ঈর্ষাদি ভাব (একেবারে) বিসর্জিত হইয়া গিয়াছে। (ইহা) সাক্ষাৎ শান্তিনিকেতন। ঐ যে অরবিন্দনিচয় একই দিবাকরের করস্পর্শে হাস্য করিতেছে, উহারা পুরাতন বীরপুরুষদিগের হৃদয়-পদ্ম, ঐ যে কলহংসমণ্ডলী—উহারা প্রাচীন কবিকুল—একতান স্বরে বীরগণের গুণগরিমা গান করিতেছে।'

—দ্বিতীয় অধ্যায়। পুষ্পাঞ্জলি

বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' গ্রন্থের 'জনস্থান মধ্যবর্তী' গোদাবরী-তীরের বর্ণনা মনে পড়ে। তাঁর অবলম্বন সংস্কৃত নাটক, কিন্তু গদ্যের ছন্দঃস্পন্দ বিদ্যাসাগরের নিজের সৃষ্টি। ভাবানুবাদের কাজ করতে গিয়ে তিনি অন্তঃকর্ণে বাংলা গদ্যের অনতিলক্ষ্য ছন্দ-ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন—সে তাঁরই আবিষ্কার। 'পুষ্পাঞ্জলি' ভূদেবের স্ব-কপোল কল্পনার পরিচায়ক। অলংকৃত ছন্দযুক্ত বাক্যবন্ধ এবং রূপকের সার্থক ব্যবহারে গদ্য কাব্যময় হয়ে উঠেছে।

৬। 'এই বঙ্গভূমি সমুদয়ই মহাতীর্থ। ইহার মৃত্তিকা দেবাদিদেব মহাদেবের শরীরবিধৌত বিভূতি। ইহার জল তাঁহার জটাজুটোচ্ছিষ্ট ব্রহ্ম-বারি। এখানকার পাদপগণ দেববৃক্ষ। এখানকার ফল-মূল-শস্যাদি সাক্ষাৎ অমৃতপর্ণ। ইহা ভূলোকের নন্দনকানন। এখানকার নরনারীগণ দেবদেবী।

কালধর্মবশে ইহারা পাতালশায়ী হইয়া আছে। কিন্তু ঐ রসাতলগামী গঙ্গাবারি কি ভস্মমাত্রাবশিষ্ট সগরসন্তানদিগকে উদ্ধার করেন নাই ?'

—একাদশ অধ্যায়। পুষ্পাঞ্জলি

বিবেকানন্দের 'স্বদেশমন্ত্র' স্মরণ করায়। তেমনি অলংকারবহুল, অধ্যাত্ম-রূপকের (পরম্পরিত) সাজ পরানো গদ্য। আবেগময় বাগ্মিতার ওজঃগুণ এই গদ্যকে শক্তি ও সৌন্দর্য দান করেছে। পরিশেষে একটি অমোঘ কাকু-বক্রোক্তি—পাঠকেরও কল্পনাকে উদ্দীপিত করে।

ভূদেবের গদ্য নীরস কাজের কথায় পূর্ণ, তাঁর ভাষা ভাবের ভাষা নয়—এইরকম একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। আশা করি, ওপরে উদ্ধৃত অংশ-গুলি সেই ভ্রান্তিনিরসনে কিছুটা সক্ষম হবে। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে তিনি মূলতঃ যুক্তিনির্ভর আত্মনিরপেক্ষ গদ্যশৈলীর লেখক। সংখ্যাক্রমে (যেমন ১, ২, ৩ ইত্যাদি) বিভিন্ন রচনা থেকে যে উদ্ধৃতি সংকলিত হয়েছে, তাতে সাহিত্যিক সৌন্দর্যই মুখ্য। তাঁর নৈয়ায়িক, সংযত, মননধর্মী গদ্য-শৈলীরও কিছু নিদর্শন এখানে উৎকলনযোগ্য :

১। আমরা কেহই দেখিতে পাইনা যে, উহারা স্ত্রী পুরুষে নিত্য নৈমিত্তিক খরচের খাতা রাখেন—উঁহাদের বিবিরাও ঘর ঝাঁইট দেন—রসুই করেন—বাসন মাজেন—কাপড় কাচেন—ইস্তিরী করেন, ছুঁচের কাজ ত করেনই—আর পল্লীগ্রামে মেয়ে-মর্দে ক্ষেতে খাটেন—গোয়াল কাড়েন।

—গৃহকার্যের ব্যবস্থা। পা. প্র

বাক্যগুলি সহজ সরল ; কমার বদলে মাঝে মাঝে ড্যাস-চিহ্ন দেওয়ায় সমগ্র বাক্যের সংহতি, অংশগুলির মধ্যে ভাবের নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। মুখের কথার আদলকেই এখানে সাধুভাষায় পরিণত করা হয়েছে।

(স্মঃ 'গোয়াল কাড়া')

২। পুত্রের বিবাহে পণগ্রহণের প্রকৃত মূল এই। কিন্তু আজি কালি ঐ মূল গাছটার উপর একটা কলম লাগিয়া গিয়াছে। এক্ষণে কন্যাকর্তার স্থানে যে-পণের জন্য পীড়াপীড়ি হয়, তাহা কেবল কুলমর্যাদা বলিয়া নয়। কুলের মান দিন দিন খর্ব হইতেছে, কিন্তু পণের হার দিন দিন বর্ধিত হইতেছে।

—কন্যাপুত্রের বিবাহ। পা. প্র

একেবারেই কাজের কথা। আমাদের ঘরোয়া সামাজিক সমস্যা বিবাহে পণ-নেওয়া। কিন্তু কলমের গাছের উপমা এসে পড়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

উপমা এখানে লৌকিক অভিজ্ঞতার নির্যাস। একটু ব্যঙ্গও আছে। অথচ সব মিলে সমাজ-দরদী লেখকের মনোবেদনাই ব্যক্ত করেছে।

৩। হিন্দু সমাজের প্রকৃতি শান্তি-প্রবণতা, ইংরাজ সমাজের প্রকৃতি ভোগ-সুখানুসন্ধানে কার্যতৎপরতা। হিন্দুসমাজ প্রধানতঃ কৃষ্যুপজীবী, ইংরাজ প্রধানতঃ শিল্প এবং বাণিজ্যোপজীবী, হিন্দুসমাজ মিলিত স্বত্ব এবং মিলিত স্বত্বাধিকার স্বীকার করে, ইংরাজ জ্যেষ্ঠাধিকার মানে এবং পৃথক স্বত্বের একান্ত পক্ষপাতী। হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, ইংরাজসমাজে বয়োধিক বিবাহই নিয়মিত। হিন্দু সামাজিক অন্তঃশাসনের পক্ষপাতী, ইংরাজ অধিকার-পালনে রাজশাসনকেই সর্বব্ধুশ করিতে উন্মুখ—ভারতবর্ষে এই তুইটি পরস্পর ভিন্নধর্মী সমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্যভাব—ইংরাজ সমাগম, সামাজিক প্রবন্ধ।

তুটি ভিন্ন দেশ, তুটি সমাজের পার্থক্য পরপর কয়েকটি বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে। অনুচ্ছেদটির আগাগোড়া বিপরীতার্থবোধক শব্দের শৃঙ্খল। সেই শৃঙ্খলের অন্তরালে অকাট্য যুক্তির পারম্পর্য আছে। বাহুল্যহীন সংহত-বাঁধুনি এই অনুচ্ছেদটি চিরকালের সার্থক সাধু গদ্যের আদর্শ।

ভূদেবের রচনাবলী থেকে কয়েকটি নিদর্শন এখানে যথেচ্ছ চয়ন করা হল। প্রতিটি অনুচ্ছেদই ভাবের দিক থেকে যাথার্থ্য-সূচক, অথচ বাহুল্যহীন। কোথাও বাক্যবন্ধ ঋজু, নিরলংকার, কোথাও উপমাশৃঙ্খল দৃঢ়। সর্বদাই সুপাঠ্য, সুবোধ্য, অতিরঞ্জনমুক্ত।

ক. পথ ক্রমশঃ উর্মিবৎ উচ্চাবচ হইতে লাগিল। চতুর্দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড যেন মৃত্তিকা উদ্ভেদ করিয়া উঠিল। অনন্তর ক্ষেত্রে সকল স্বল্পশস্য, পরে কণ্টকীবনসমাকীর্ণ, পরিশেষে উদ্ভিদ্‌-সম্বন্ধরহিত আরক্ত কঙ্করময় দৃষ্ট হইল। সহসা সম্মুখভাগে যেন তুষারসংঘাত, যেন স্ফটিকস্তূপ, যেন প্রভূত রত্নরাশি, সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহাদেবরূপী অতি প্রোজ্জ্বলাঙ্গ একটি পর্বত বিদ্যমান।

খ. বর্ষাকালে যখন গঙ্গার তুইটি বরপ্রদা নদী বরণা এবং অসি পরস্পর মিলিত হইয়া যায়, তখন আরঙ্গেব বাদশাহের প্রতিষ্ঠিত মসজিদের উর্দ্ধ হইতে দেখিলে মৎস্যোদরী কাশীর কি অপরূপ সৌন্দর্যই অনুভূত হইতে থাকে। উত্তর-বাহিনী গঙ্গার পূর্বধার হইতে বারাণসীর সৌধশ্রেণী অবলোকন করিতে করিতে মনে হয়, ইহাই বুঝি চন্দ্রচূড়ের ললাট-নিহিত চন্দ্রকলা। মৎস্যোদরী দেখিলে

বোধহয় এই স্থানটি সত্য সত্যই ত্রিশূলীর ত্রিশূলোপরি সংরক্ষিত। পৃথিবী প্রলয়জলে প্লাবিত হইয়া গেলেও এই পুরী মগ্ন হইবে না।

গ· রাত্রি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, ঘোর অন্ধকার। দূরস্থ কি নিকটস্থ কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হয় না—আপনার শরীরকেও দেখা যায় না। এমন সময়ে বামা-কণ্ঠে শব্দ হইল, 'ঠাকুর'! যদি পরপারে যায়েন হোলন্দে আসুন। ব্রাহ্মণ শব্দানুসারে নামিলেন; একমাত্র বৃক্ষ বিনির্মিত একটি নৌকার উপর উঠিলেন এবং নৌকার কর্ণের দিকে দৃষ্টি করিয়া অনুমান করিলেন যেন একটি যুবতী মাত্র নৌকার কর্ণধার, নৌকাতে আর কেহ নাই। নৌকা দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কত যে অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তিনি মৌনী হইয়া রহিলেন। নৌকা পরপারে পৌছিল। নৌকাবাহিনী কহিল,—ঐ আপনার সম্মুখে কামাখ্যাশৈল। আপনি পশ্চিমমুখে গমন করিলেই তীর্থস্থানে যাইবার পথ পাইবেন। আমি ভূমীন্দ্রকন্যা (ভূমীন্দ্র কন্যাবকা মাতা), আমার নাম বাসনা (অনাদি বাসনৈব জগৎ সৃষ্টি হেতুঃ) কামাখ্যাযাত্রীদিগকে পরপার হইতে লইয়া আসাই আমার কর্ম।

ঘ· একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গান্ধার দেশের নির্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে দিনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্তী হইয়া খরতর কিরণ-নিকর বিস্তার দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে, পথিক অধ্বশ্রমে ক্লান্ত অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ রজ্জুমুক্ত করিয়া দিলেন এবং আপনি সমীপবর্তী নির্ঝরতীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্থানটি ভয়ানক এবং অদ্ভুত রসের আস্পদ হইয়া আছে। নিবিড় বনপত্রে সূর্যকিরণ প্রায় সর্বতো-ভাবেই আচ্ছাদিত; কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশমান মাত্র। বৃক্ষগণ অতি দীর্ঘ। কাহার কাহার গাত্রে একটিও শাখাপল্লব না থাকাতে বোধহয় যেন, উহারা উপরিস্থিত পূর্ণচন্দ্রাতপও ধারণের স্তম্ভ হইয়াছে, অদূরে বনহস্তিগণ সুশীতল ছায়াতলে সুপ্তিসুখানুভব করত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনতরুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগের অপেক্ষাকৃত খর্বতা প্রমাণ করিতেছে।

ঙ· বৃদ্ধ বাদশাহ ক্ষণকাল চিন্তামগ্ন থাকিয়া পরে রোসিনারাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'পূর্ব-বৃত্তান্ত-স্মরণ করিয়া অনর্থক কষ্ট পাইবার আবশ্যকতা নাই, তুমি বুদ্ধিমতী, যাহা পরামর্শসিদ্ধ হয়, তাহাই কর। আমার বুদ্ধির অনেক হ্রাস হইয়াছে। বোধকরি আর বহুদিন দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না—অনুমান করিয়াছিলাম, জগতে আর প্রার্থনীয় কিছুই নাই—কিন্তু তোমার গুণে বশীভূত হইয়া এইমাত্র ইচ্ছা হয় যে, তোমাকে সুখভাগিনী দেখিয়া যাই।' এই বলিয়া

বৃদ্ধ পৌত্রীর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রোসিনারাও ক্ষণকাল কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। পরে কহিলেন—'পিতা, মহা-রাষ্ট্রপতির যেরূপ সমাদর বা অনাদর করেন, তাহা দেখিয়াই কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করিতে পারিব। বৃদ্ধ কহিলেন, 'তুমি অন্যান্য অন্তঃপুরবাসিনীগণের সমভিব্যাহারে যাইয়া জালিরন্ধ্রের অন্তরাল হইতে স্বচক্ষে সমুদায় দেখিও।'

বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য উদ্ধৃত করেই এ-প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাক। তিনি বলেছেন :

'One of the best masters of a pure and vigorous Bengali style—neither characterized by the somewhat pedantic purity of Vidyasagar, nor rough and homely like Tekchand and Hutam—one of the best masters—we say, of Bengali style is Babu Bhudeb Mukherji.'

উপসংহার

বক্ষ্যমান প্রস্তাবে চিন্তানায়ক ভূদেবের একটি সমগ্র আলেখ্য অংকন করা হয়েছে। তিনি যে সেকালের একজন মনস্বী ব্যক্তিমাত্র ছিলেন না, সারা দেশে তিনি যে একটি স্বাজাত্যবোধের, আত্মনির্ভরতার এবং আত্মগৌরবের পরিমণ্ডল রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন—এই সত্যের দিকে যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

অনেকের ধারণা, ভূদেব ইংরেজশাসনাধীন ভারতবর্ষই চেয়েছেন, স্বায়ত্ত শাসন নয়, তাঁদের সামাজিক প্রবন্ধের ভবিষ্যবিচার অংশে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ভূদেব শ্লেষাঢ্য ভাষায় বলেছেন, 'আইনের চক্ষে সকল প্রজাই সমান। এই কথাটিও অক্ষুন্ন নাই। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা সত্বেও স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাদিগের ব্যবহারশাস্ত্র বজায় থাকিবে। অধিকাংশই বজায় আছে, সত্য। কিন্তু ঐ শাস্ত্রের যেখানে যেখানে ফাঁক পাওয়া যাইতেছে—সর্বস্থলেই অসংকুচিত ভাবে ইারাজী ব্যবস্থা-সূত্রের প্রবেশ হইতেছে।' মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত- শ্রেণীর মনে যে আশা জেগেছিল উক্ত দশটি অনুচ্ছেদে সেই আশাভঙ্গের ও মোহভঙ্গের পরিচয় মেলে। (ইংরাজাধিকার-ইংরাজের বৈদেশিক ভাব। পৃ-২০২-২০৩)

মনে রাখতে হবে, অর্থনৈতিক শোষণ অথবা সমৃদ্ধির নিরিখে বিশেষ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা জনগণের পক্ষে কল্যাণকর কিনা—এই আধুনিক ঐতিহাসিক দৃষ্টি ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনিই প্রথম প্রয়োগ করেন। পার্লামেণ্টে উত্থাপিত বিবরণের উদ্ধৃতি যোগে আলোচনার ভঙ্গিটি (উপসংহার-সা· প্র) বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

তাঁর সমাজচিন্তা সম্পর্কে যথার্থভাবেই বলা যায়,—'*Bhudeb's, then, was not a Sociology for the sake of sociology. It was rather a necessary means to an end, namely, to transform an otherwise incohate India into a veritable homogeneous nation.*'

Socialist Perspective, ঐ, ২১৯

নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যচর্চা তাঁর অভিপ্রেত নয়, তাঁর জীবনের ব্রত ও লক্ষ্য অনেক ব্যাপক। তবু ভাবতে বিস্ময় লাগে, সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি কত

স্বচ্ছ ছিল, কাব্য-নাটকের ভাবজগতে প্রবেশের ক্ষমতা কত অনায়াস ছিল! আমাদের মনে হয়, 'বাঙ্গালা সাহিত্য,' 'বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি' এবং 'সাহিত্যজীবী' প্রবন্ধ তিনটি এডুকেশন গেজেটের পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করে এখনি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়া উচিত। তাহলে সাহিত্যবোদ্ধা ভূদেবের সঙ্গে একালের পাঠকের পরিচয় আরো নিবিড় হতে পারবে।

পরবর্তী বহু লেখকের ইতিহাসচিন্তা, সমাজচিন্তা এবং স্বদেশভাবনাকে তিনি প্রভাবিত করেছেন। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও ইংরেজের ভেদনীতি বিষয়ে তিনিই প্রথম আমাদের সজাগ করেছেন।

তাঁর গদ্যনিরীক্ষা আজও আমাদের অনুশীলনের যোগ্য। যেমন যুক্তিসিদ্ধ নিরাভরণ নিরাবেগ ভঙ্গি মনন-প্রবন্ধের, তেমনি আবেগ ও কল্পনাসমৃদ্ধ বর্ণনা-রীতি 'পুষ্পাঞ্জলি'-র, আবার কাহিনীবিন্যাসের ক্ষেত্রে স্থলবিশেষে রোমান্টিক কাব্যসৌন্দর্য, অতীত ইতিহাসে প্রাণস্পন্দযোজনা, চরিত্রের আত্মসমীক্ষা— উপযুক্ত মর্যাদা পেয়েছে।

সুতরাং ভূদেব-ব্যক্তিত্বের পূর্ণ-পরিধি আবিষ্কার আমাদেরই আত্ম-উপলব্ধির সহায়ক। বর্তমান নিবন্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সেই বিচিত্রকীর্তি, অসামান্য ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির আন্তরিক প্রয়াস মাত্র।

পরিশিষ্ট—ক

'বিনয় সরকারের বৈঠকে' গ্রন্থ থেকে সংকলিত

বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্ব'

স্থবোধ ঘোষাল—উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

সরকার—এই সম্বন্ধে 'জ্ঞান ও কর্ম্ম'—জাতীয় মাত্র দুখানা বই নজরে প'ড়ছে। দুই গ্রন্থকারের। প্রথম বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮)। দ্বিতীয় ভূদেবের 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২)। বাস। এইখানেই ফিরিস্তি শেষ। (পৃ-৬২)

লেখক—বাঙলায় বঙ্গদর্শনের প্রভাব সম্বন্ধে আর কিছু বলা চলে?

সরকার—উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে (১৮৫০-৭৫) বহুসংখ্যক বাঙালী কোঁত-প্রেমে মশগুল ছিলেন। কোঁতদর্শনের প্রবর্ত্তক ছিলেন জজ দ্বারকা মিত্র। তিনি ফরাসী ভাষা জানতেন। খিদিরপুরের যোগেন ঘোষ ছিলেন কোঁত-দর্শনের অন্যতম পাণ্ডা। বাঙালীরা বোধহয় তা আজও জানে। ··ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও কোঁত-মতে খানিকটা সায় দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে ফরাসী দার্শনিক কোঁত বঙ্গসমাজে বেশ কিছু দিগ্‌বিজয় ভোগ করেছিলেন। (পৃ-৬৭)

লেখক—'ধর্মতত্ত্ব' আর 'কৃষ্ণচরিত্র' বই দুটার বাণী বা মন্তব্যগুলা সম্বন্ধে আর কিছু বলবেন?

সরকার—শুধু মনে রাখতে হবে যে, আমি 'ধর্ম-তত্ত্ব' বইটাকে 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' জাতের বই হিসাবে এখানে উল্লেখ করেছি। এর ভেতর কোঁত-দর্শন আছে বলে বইটা পচে যাচ্ছে না। এ রচনা মামুলি তর্জ্জমা নয়। ···একমাত্র কোঁত এই বইয়ের প্রেরণা-দাতা নয়। কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এই বইয়ের ভেতরকার মতামত আসল আলোচ্য বস্তু নয়। আসল আলোচ্য বস্তু বড় বহরের বাংলা বই। এই হিসাবে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' বইয়ের অন্যতম বড়দা। তারই প্রায় সম সাময়িক, অর্থাৎ আর একখানা বড়দা হচ্ছে ভূদেবের 'সামাজিক প্রবন্ধ।' (পৃ-৬৮)

সমাজশাস্ত্রী ভূদেব

লেখক—আচ্ছা, এইবার 'সামাজিক প্রবন্ধ' সম্বন্ধে কিছু বলুন।

সরকার—এই বইটা বেশ-কিছু বড়-বইও বটে। তাছাড়া এটা সাময়িক

ও অসংলগ্ন প্রবন্ধাবলীর সংগ্রহ-পুস্তক নয়। চিন্তাগুলো পরপর গড়ে উঠেছে। কোথাও আলোচ্য বিষয়ের ফাঁক চোখে পড়েনা। দশাননী চোখ নিয়ে ভূদেব এই বই রচনা করেছিলেন। খাপছাড়া ভাবে কতকগুলা ভালো ভালো কথা বলে যাওয়া অথবা পরকীয় মতামত খণ্ডন করা ভূদেবের মৃতলব ছিল না। একখানা ষোলকলায় পরিপূর্ণ সমাজ-শাস্ত্র-বিষয়ক বই খাড়া করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছেও। এই বইয়ের জুড়িদার বা পরিপূরক আর দুখানা বই তিনি লিখেছেন। একটা 'পারিবারিক প্রবন্ধ' আর একটা 'আচার প্রবন্ধ।' এই দুটাও সর্বাঙ্গসুন্দর ষোলকলায় পরিপূর্ণ বই। তিনখানা বই একত্রে দেখলে সমাজ-দার্শনিক ভূদেবকে দুনিয়ার সমাজশাস্ত্রীরা খুব উঁচু ঠাঁই দিতে বাধ্য হবে। বইগুলির ভেতরকার মতামত সম্প্রতি আলোচ্য নয়। প্রত্যেক বইয়ের গাঁথনি সম্বন্ধে এইসব কথা বলছি। বই হিসাবে 'সামাজিক প্রবন্ধ' বাঙালী মগজের অপূর্ব সৃষ্টি। বঙ্গ সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল রত্নরূপে এর কিম্মৎ দিন দিন বেড়ে চলবে।

লেখক—বইটার ভেতর কিছু প্রবেশ করুন না?

সরকার—তাহলে মোলাকাতের বহর বেড়ে যাবে। অনেক বকা হয়ে গেছে।

লেখক—তবুও দু-এক কথা বলুন।

সরকার—ভূদেবকে কোঁত-প্রেমে মশগুল বলেছি। কিন্তু সকল বিষয়ে নয়। কোঁত-প্রচারিত শ্রেণী-বিন্যাসকে ভূদেব হিন্দু বর্ণাশ্রমের জুড়িদার বিবেচনা করেন। এই হিসাবে তিনি কোঁত-ধর্মী। কিন্তু বঙ্কিমের মতন ভূদেব ষোল আনা কোঁত-ভক্ত বা কোঁত-ধর্মী নাস্তিক মানব-পূজক নয়। 'সামাজিক প্রবন্ধ' বইয়ের আসল মুদ্দাগুলি কোঁত দর্শনের বিরোধী। কোঁত-প্রচারিত মতগুলি খণ্ডন করা হয়েছে জোরের সহিত। তাছাড়া সেকালের লোকপ্রিয় বিলাতী সমাজদার্শনিক বাক্‌লকেও ভূদেব চরম ঘা লাগিয়েছেন। বাক্‌ল ছিলেন সমাজের উপর ভৌগোলিক প্রভাব সম্বন্ধে কট্টর অদ্বৈতবাদী। বাক্‌লকে ভূদেব জুতিয়েছেন জবরদস্তভাবে। এইজন্য আমি যার-পর-নাই খুশী।

লেখক—'সামাজিক প্রবন্ধ' বইয়ের আর কিছু বিশেষত্ব আছে?

সরকার—এখনও কিছুই বলিনি। 'মহাভারত' বকাতে চাস দেখছি? এক কথায় বলি, ভূদেব চৌকোস লোক। স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠায় তাঁর নজর ছিল। বিদেশে লোক পাঠিয়ে আধুনিক কলকব্জা ও যন্ত্রপাতিতে আর কলা-বিজ্ঞানে, ওস্তাদ তৈয়ারি করানো তাঁর পাঁতির অন্তর্গত। অথচ লোকটা

চরমভাবে 'সনাতনী' গোঁড়া হিন্দু। তাছাড়া তাঁর রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার দরদও মন্দ ছিল না। ডোজটা বোধ হয় হোমিওপ্যাথিক। কিন্তু বেশ উল্লেখযোগ্য বটে। 'সামাজিক প্রবন্ধ' আজও খুব বাঙলার পড়বার উপযুক্ত বই। এটাকে 'ক্লাসিক' ভাবে ছিকেয় তুলে রাখা উচিত নয়। মাঝে মাঝে পাতা উল্টানো ভাল।

লেখক—ভূদেবের মতামতগুলি আপনি মেনে চলতে প্রস্তুত আছেন ?

সরকার—এই প্রশ্নের জবাবে এককথায় 'হাঁ' বা 'না' বলা সম্ভব নয়। ভূদেবের সঙ্গে আমার প্রাণে প্রাণে মিল আছে। তাঁকে আমি খাঁটি স্বদেশ সেবক, স্বাধীনতার পূজারী, স্বরাজ-সাধক বিবেচনা করি। ভূদেব চিরকাল আমার প্রণম্য। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে কোনো বাঙালীর পক্ষে যতদূর চরমপন্থী হওয়া সম্ভব ভূদেব প্রায় ততদূর গিয়েছিলেন। বিবেকানন্দকেও আমি ভূদেবের কোঠেই ফেলি। সেইযুগের কোনো বঙ্গসন্তানকে এই দুজনের চেয়ে বড় বিবেচনা করা আজও আমার পক্ষে অসম্ভব। এই দুইজনই আমার সমানভাবে পূজার স্থান। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে ভূদেব বিবেকানন্দর অনেক কিছুই বাতিল।

লেখক—কোন কোন বিষয়ে বাতিল ?

সরকার—রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা আর আর্থিক উন্নতি বিষয়ক মতামত আলোচনা করছি না। বলছি যে, পারিবারিক ও সামাজিক পাঁতি সম্বন্ধে ভূদেবের কোনো কোনো মতামত বর্ত্তমানে আর চলতে পারে না।

লেখক—কি চলতে পারে না ?

সরকার—ভূদেব প্রাচীন আচার-সংস্কারের ওপর 'জোর' দিয়েছেন। আচার-সংস্কারের অনেক কিছুই হয়ত ভাল—স্বাস্থ্য, শক্তি ইত্যাদি সুফলের জন্য জরুরি। কিন্তু এই অতিজোরটা আমার পছন্দসই নয়। ভূদেব খানিকটা ভবিষ্যপন্থী সন্দেহ নাই। নয়া কিছু আমদানি করতেও তিনি পেছপাও নন। কিন্তু যা রয়েছে তা যথাসম্ভব আঁকড়ে ধরার দিকে মেজাজও তাঁর চরম। সেই মেজাজের বিরুদ্ধে চলতে হয় এই অধমকে। বিংশ শতাব্দীর বাঙালী কমসে কম বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক বাঙলায় অনেকেই—এই প্রাচীনপন্থী, স্থিতি-ধর্ম্মী, ঐতিহ্যপ্রেমিক মেজাজের বিরুদ্ধেই চলছে। আমাদের চেষ্টা হচ্ছে নয়া-নয়া জিনিষ আমদানি করা। তার ফলে পুরাণো যতটুকু টেকসই থাকুক, যা টেকসই নয় তা মরুক। পুরাণোকে বাঁচিয়ে নয়া আমদানি করা এই অধমের মেজাজ নয়।

লেখক—কিন্তু বাংলাদেশের জনসাধারণ কি আপনার মতের স্বপক্ষে আছে? সাম্প্রতিক যুবক বাঙলার চরমপন্থী সমাজ-দার্শনিকদেরকে শহর-মফঃস্বলের হিন্দুরা সম্মান করে কি? প্রাচীনপন্থী ঐতিহ্যধর্ম্মী আচার সংস্কার বদলেছে কতটা?

সরকার—ঠিক বলেছিস। এই অধম কলকে পাই না।, বাঙালী সমাজের আধ-কাঁচ্চাও নয়া পথের পথিক হয়েছে কিনা সন্দেহ। অতি সামান্য অংশ নয়া পথের পথিক। বর্ণাশ্রমের জাত-পাত এখনো প্রায় সে কালের অবস্থায়ই রয়েছে। সমাজিক ভাঙাগড়া বা রূপান্তরের দৌড় অতি কম।

এই হিসাবে ভূদেবের 'সামাজিক প্রবন্ধ'ই আজ ১৯৪৪ সনেও বাঙালী সমাজের প্রায় পৌনে ষো'ল আনা অংশের খাঁটি সমাজদর্শন। এইজন্যই আমি ভূদেবের 'সামাজিক প্রবন্ধ,' 'পারিবারিক প্রবন্ধ' আর 'আচার প্রবন্ধ' আজও ফেলিতব্য বর্জ্জনীয় মাল বিবেচনা করি না। এই বই তিনটার কিস্মৎ অনেকদিন পর্যন্ত বাঙালী সমাজে অতি উঁচু থাকতে বাধ্য।

লেখক—'জ্ঞান ও কর্ম্ম' জাতীয় বইয়ের জুড়িদার আর কোনো বই দেখতে পাচ্ছেন ১৯৩০ পর্যন্ত?

সরকার—আর ত চোখে পড়ছে না। কিন্তু বলেছি, আবার বলছি, গবেষণা চালানো উচিত। বাঙালী জাতকে আর বাঙলা সাহিত্যকে 'ভদ্র-লোকের পাতে দেবার' উপযুক্ত করে তুলবার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা রচনাগুলি খুঁটে খুঁটে বিশ্লেষণ করা জরুরি। সঙ্গে সঙ্গে ১৯০৫ সনের পরবর্তী বছর চল্লিশেকের বাংলা সাহিত্যের খতিয়ান করাও যুক্তিসঙ্গত। গবেষকরা লাগুন এইসব দিকে।

লেখক—'জ্ঞান ও কর্ম্ম' বইয়ের মতামত আপনার কতটা পছন্দসই?

সরকার—এর ভেতরকার চিত্ত-বিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বাদ দিয়ে যাচ্ছি। সাধারণ নীতিবিজ্ঞান বা কর্ত্তব্যবিজ্ঞান সম্বন্ধেও কিছু বলতে চাই না। বাকিটুকু হচ্ছে—অনেকটা ঠিক যেন ভূদেবের 'সামাজিক প্রবন্ধ,' 'পারিবারিক প্রবন্ধ' আর 'আচার প্রবন্ধ' বই তিনটির পরবর্তী ধাপ। গুরুদাস আর ভূদেব মোটের উপর এক গোত্রের সমাজদার্শনিক। প্রাচীন সংস্কারের দরদ, আর ঐতিহ্যের সমাদর ভূদেবদর্শন আর গুরুদাসদর্শনের আসল খুঁটা। কাজেই দুই দর্শনই এই অধমের বঙ্গদর্শনে ঠাঁই পেতে পারে না। কিন্তু মজার কথাটা আগেই বলে চুকেছি। আজও বাঙলার নরনারী ভূদেব-গুরুদাসের পথেই চলছে। অর্থাৎ ভূদেবের পরবর্তী বাঙালী সমাজ প্রায় ঠিক যেন ভূদেবের যুগেই রয়েছে। (পৃ-৭৬)

গুরুদাস বনাম ভূদেব (পৃ-৭৭-৭৮)

লেখক—গোঁড়া হিন্দুয়ানির হিসাবে 'সামাজিক প্রবন্ধ' আর 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' এই দুই রচনায় প্রভেদ কি রূপ ?

সরকার—সমাজব্যবস্থার তরফ হতে প্রশ্নটা চিত্তাকর্ষক। ভূদেব আর গুরুদাস দুইজনই এক কাঠামোর লোক। এঁদের মেজাজ সনাতনী হিন্দুত্বময়। প্রাচীনের আবহাওয়ায় দুজনেরই জীবন প্রধানতঃ চলে। দুইজনেই নিষ্ঠাবান বা আচারনিষ্ঠ হিন্দুয়ানির প্রতিনিধি। কিন্তু প্রভেদও লক্ষ্য করা সম্ভব। 'সামাজিক প্রবন্ধ' ১৮৯২ সনে প্রকাশিত আর 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' প্রকাশিত ১৯১০ সনে। কাল হিসাবে গুরুদাসের বই ভূদেবের বইয়ের পরবর্তী তো বটেই এমনকি মাস হিসাবেও খানিকটা পরবর্তী।

লেখক—ভূদেবে আর গুরুদাসে গোঁড়ামি বিষয়ক পার্থক্য পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় কি ?

সরকার—বোধ হয় কিছু কিছু যায়। গুরুদাসের মাঝে ঐতিহ্য-প্রীতি চরম কথা নয়। আচার নিষ্ঠা, প্রাচীনের দরদ, মুনি-ঋষিদের বিধান আর হিন্দু সংস্কৃতির ধারা—এইসব কথা গুরুদাসের চিন্তাশক্তিকে পুরাপুরি দখলে রাখতে পারেনি। এই হিসাবে গুরুদাসের বেশ কিছু স্বাধীনতা আছে। ভূদেবের চিন্তা-প্রণালীতে সনাতন, অতীত, ঐতিহ্য, হিন্দু সংস্কার ইত্যাদি বস্তু খুব প্রবল। 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' বইয়ে এইসবের আওতা তত বেশী প্রবল নয়।

সুবোধ—বিংশ শতাব্দীর মানুষ হিসাবে আপনি হিন্দু ধর্মের দেবদেবী সম্বন্ধে কি বলতে চান ? মূর্তি পূজার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি ?

সরকার—ভূদেবের 'আচার প্রবন্ধ' মাফিক বার মাসে তের পার্বণ আমার পছন্দসই। তবে 'অতিমাত্রায়' আচার নিষ্ঠা বর্জনীয়। (পৃ-৮৪)*

*পৃষ্ঠাসংখ্যা 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' গ্রন্থের।

পরিশিষ্ট—খ

হেক্টর বধ কাব্যের উৎসর্গপত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায়

মহাশয় সমীপেষু,

প্রিয়বর—

প্রায় চারি বৎসর হইল, আমি শারীরিক পীড়িত হইয়া, এমন কি, ৩-৪ মাস স্বকর্মে হস্তনিক্ষেপ করিতে অশক্ত হইয়াছিলাম, সময়াতিপাতার্থে উরূপা খণ্ডের ভগবান কবিগুরুর জগদ্বিখ্যাত ইলিয়াস নামক কাব্য সদা সর্বদা পাঠ করিতাম। পাঠের সময় মনে এইরূপ ভাব উদয় হইত যে, এ অপূর্ব কাব্যখানির ইতিবৃত্ত স্বদেশীয় ইংলণ্ড-ভাষানভিজ্ঞ জনগণের গোচরার্থে মাতৃভাষায় লিখি। লিখিত পুস্তকখানি চারি বৎসর মুদ্রালয়ে পড়িয়াছিল। এমন সময় পাই নাই যে ইহাকে প্রকাশি। একস্থলে কয়েকখানি কাপির কাগজ হারাইয়া গিয়াছে; (৪র্থ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে) সেটুকুও সময়াভাব প্রযুক্ত পুনরায় রচিয়া দিতে পারিলাম না। বোধহয়, এতদিনের পর জনসমূহ সমীপে আমি হাস্যাস্পদ হইতে চলিলাম। কিন্তু তুমি এবং তোমার সদৃশ বিজ্ঞতম মহোদয়েরা এবং অন্যান্য পাঠকগণ উপরিউক্ত কারণটি মনে করিয়া পুস্তকখানি গ্রহণ করিলে ইহার শোধনার্থে ভবিষ্যতে কোন ত্রুটি হইবে না। এবং অবশিষ্ট অংশও অতি-শীঘ্র প্রকাশ করিতে যত্নবান হইব।

এ বঙ্গদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম, তাহার কোনই সন্দেহ নাই; কেন না তোমার পরিশ্রমে মাতৃভাষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। পরমেশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, এই প্রার্থনা করি। যে শিলায় তুমি, ভাই, কীর্তি-স্তম্ভ নির্মিতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট করিতে অক্ষম।

উত্তরে কবিবন্ধু মধুসূদন দত্তকে লেখা ভূদেবের পত্র—

পরম প্রণয়াস্পদ

শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহোদয়েষু,

ভাই,

তুমি স্বপ্রণীত হেক্টরবধ কাব্য গ্রন্থে আমার নামোল্লেখ করিয়া আমাদিগের পরস্পর সতীর্থ সম্বন্ধের এবং বাল্যপ্রণয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছ। আমি

কখনই সে সম্বন্ধ এবং সেই প্রণয় বিস্মৃত হই নাই, হইতেও পারি না। যৌবন-সুলভ প্রবলতর আশা[illegible]দিত হইয়া মনে মনে যে সকল উন্নত অভিপ্রায় সঞ্চিত করিতাম, তোমা[illegible]ষ্টান্তই বিশেষরূপে তৎসমুদয়ের উত্তেজক হইত। তোমার যৌবনকালের ভাব আমার জীবনের একটি মুখ্যতম অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। তখন আমাদিগের পরস্পর কত কথাই হইত—কত পরামর্শই হইত, কত বিচার ও কত বিতণ্ডাই হইত। এখনও কি তোমার সে সকল কথা মনে পড়ে? তুমি বিজাতীয় প্রণালীর কিছু অধিক পক্ষপাতী ছিলে, আমি স্বজাতীয় প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। এই মতভেদ নিবন্ধন যে যন্ত্রণা হইত, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়? আহা তখন কি একবারও মনে করিতে পারিতাম যে তুমি বিজাতীয় মহাকবিগণের সমস্ত রত্ন আহরণ করিয়া মাতৃভাষায় শোভা সম্বর্ধনপূর্বক বাঙ্গালার অদ্বিতীয় মহাকবি হইবে? সেই সময়ে তুমি যে-সকল সুন্দর ইংরাজী পদ্য রচনা করিতে, তাহা পাঠ করিয়া আমার পরম আনন্দ হইত। আমি তখন হইতে জানিতাম যে, তুমি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু সেই কাব্য যে মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা অথবা হেক্টরবধ হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। তুমি ইংরাজীতে কোন কাব্য লিখিয়া ইংরাজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই আমি মনে করিতাম। ফলতঃ তোমার শক্তির প্রকৃত গরিমা তখন অপ্রকাশিত এবং আমার বোধাতীত ছিল। তুমি ম্রিয়মান মাতৃভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিলে, তুমি ইহাতে সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিলে। তাই তোমার এই বিজাতীয় ভাষা অধ্যয়নের পরিশ্রম সার্থক, তোমার এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ সার্থক।

কোন বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজী ভাষায় উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা যদি সঙ্গত হইতে পারে তাহা তোমার পক্ষেই সঙ্গত হয়। তুমি অল্প বয়সেই ইংরাজী ভাষার মর্মজ্ঞ হইয়াছিলে, যৌবনাবধি ইংরাজদের সহবাস করিতেছ, বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষার মূল ভাষা সমস্তের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মিয়াছে। ফলতঃ তোমার প্রণীত যে কয়খানি ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ আছে, তত্তুল্য ইংরাজি গ্রন্থ বোধহয় কোন বাঙ্গালী কর্তৃক বিরচিত হয় নাই। কিন্তু তোমার সেই গ্রন্থে আর তোমার মেঘনাদবধ প্রভৃতি বাংলা গ্রন্থ কত অন্তর। তোমার বাংলা কাব্যগুলি তোমাকে এতদ্দেশীয় শিক্ষিতদলের মুখস্বরূপ, তাহাদিগের গৌরব-স্বরূপ এবং তাহাদিগের পথপ্রদর্শক স্বরূপ করিয়া স্থাপন করিয়াছে।

অধিক কি লিখিব? তোমার শরীর নিরাময়, তোমার মন সচ্ছন্দ, তোমার সাংসারিক শ্রী বর্ধনশীল এবং তোমার কবিশক্তি চির-প্রভাবশালিনী থাকুক, এই আমার প্রার্থনা। ত্বদীয়—শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়

'মধুসূদন একদিন চুঁচুড়ায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। ভূদেব তাঁহার সতীর্থ, বাল্যবন্ধু। মধুসূদনের উদার চিত্ত ভূদেবের প্রতি পূর্ববৎ অনুরাগে রঞ্জিত ছিল। আহার করিবার পূর্বে মধুসূদন ভূদেবকে বলিয়াছিলেন, আমাকে কাপড় দেও, আমি কাপড় পরিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া খাবার খাইব। তিনি যখন ধুতি-চাদরে ভূষিত হইয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন ভূদেব বলেন, ভাই, মধু, এই বেশে একখানি মেঘনাদবধ কাব্য হাতে নিলে, তোমাকে বেশ মানায়।' (মধু-স্মৃতি, পৃ-৩৪৭)

ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের পত্র ঃ

(১)

শ্রদ্ধাস্পদেষু

তিনকড়ি বাবুর* নিকট এক সেট পুস্তক দিয়াছি। তন্মধ্যে আর একটি নূতন পুস্তক ধর্মতত্ত্ব আছে। ঐ গ্রন্থ পাঠকালে আপনার যাহা কিছু মনে উদয় হয়, অথবা গ্রন্থকারকে বলিবার প্রয়োজন হয়, তাহা যদি অনুগ্রহ করিয়া মার্জিনে নোট রাখেন, তবে ভবিষ্যতে উপকৃত হইতে পারিব। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

৮।৬।৮৮

১৩ই জুন ১৮৮৮

২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

(২)

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার অনুগ্রহপত্র পাইয়াছি। আমার পুস্তকগুলি আপনি নিজে স্টেশনে আসিয়া লইয়া গিয়াছেন, এবং অনুরুদ্ধ না হইয়াও পড়িয়া থাকেন, ইহার অপেক্ষা পুস্তকের আদর আর কি বেশী হইতে পারে? ইহাই আমার আশার অতীত ফল।

পুস্তকগুলি যেরূপ বাজারে বিক্রয় হয়, সেইরূপ বাঁধানই আপনাকে পাঠান হইয়াছে, ভাল করিয়া বাঁধান হয় নাই। সকলগুলি একরকম বাঁধান, এবং ইহার অপেক্ষা ভাল হয়, এইরূপ করিয়া বাঁধাইয়া পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু

*-তিনকড়িবাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভাগিনেয়। ইনি ফরাসী কাগজে ভারতের স্বদেশী আন্দোলনের সংবাদ ছাপাতেন। বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে সাতবছর পণ্ডিচেরিতে পলাতক ছিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত/'দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম,' পৃ-৮৭।

বাঁধান পুস্তক আবার বাঁধাইতে গেলে ছোট মার্জিন আরও ছাঁটা পড়িয়া যাইবে, এবং অবাঁধা পুস্তক এক সেট পুরা হয় না, এজন্য যেমন ছিল তেমনি পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছি।

ভূদেবকে লিখিত **হেমচন্দ্রের চিঠির** (৯ই নভেম্বর, ১৮৮২) **উত্তরে ভূদেব** হেমচন্দ্রকে এই চিঠি লেখেন :

প্রিয় হেমবাবু,

তোমার স্নেহপূর্ণ ও সম্মানসূচক পত্রের প্রত্যুত্তরে মাতৃক্রোড়ে শিশুরূপ মানবসমষ্টির চিত্র (হিউম্যানিটি) সম্বন্ধে কোম্‌টির ধারণার বিষয়ে প্রথমে আমার কিছু লিখিবার আছে। এ ধারণাটি অতীব সুন্দর সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার উৎপত্তি কোথায় এবং ইহাতে সত্যই বা কতদূর ? মাইকেল এঞ্জেলো র‍্যাফেল ও টিসিয়েন প্রত্যেকে আপনাদের উদ্ভাবনী শক্তি অনুযায়ী যে মাতৃ-মূর্তির (ম্যাডোনা মূর্তি) অমর চিত্র অংকিত করিয়া গিয়াছেন, ইহা স্পষ্টতঃই তাহা হইতে সংগৃহীত। এই চিত্রকরেরা কোথা হইতে এ শক্তি লাভ করিলেন ? খ্রীষ্টধর্মের পৌরাণিক কথা হইতে। খ্রীষ্টধর্মের উদ্ভব কোথায় ? ইহুদীদিগকে পুরুষানুক্রমে যে-সকল ক্ষমতাপন্ন প্রতিবাসী জাতিদিগের অধীনে থাকিতে হইয়াছিল সেই সকল জাতীয় দ্বৈত উপাসনার ফলে সংঘটিত ভ্রান্তমত সংযুক্ত জুডাইজম্ হইতেই অধিকাংশ বোধহয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য ধারণা যাহা (সেণ্ট পল তাঁহার নিম্নলিখিত উজ্জ্বল মধুর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, 'যাঁহাতে আমরা বিচরণ করি, জীবিত আছি এবং যাঁহার সত্তায় আমাদের সত্তা' জুডাইজমে সে ধারণার সম্পূর্ণ অভাব এবং সেইজন্য খ্রীষ্টধর্মেও ইহার বিশেষ অভাব আছে। বস্তুতঃ খ্রীষ্টধর্ম আর্যদিগের মধ্যে কতকটা অগ্রবর্তী জাতিদিগের দ্বারায় গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও ইহুদিধর্মের যে মলের সহিত ইহার উৎপত্তি—সে-মল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই। এরূপ অবস্থায় মাতৃমূর্তি (ম্যাডোনা মূর্তি) মানব জাতিবাচক বলিয়া ধরিতে গেলে স্বতঃই অপরিপূর্ণ। যদি কোম্‌টি ভারতে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি অধিকতর পরিসর গ্রহণ করিত এবং তিনি তাঁহার পূজার লক্ষ্য মানবজাতিকে বিশ্ব প্রকৃতির সহিত সম্ভবতঃ একই করিতেন। আরও দেখ, মানবচিত্র যেরূপ কোম্‌টি ধারণ করিয়াছেন, তাহা কি নির্দেশ করিতেছে ? শিশুক্রোড়ে একটি যুবতী মূর্তি। দেখিতেই পাইতেছ যে ইহাতে দুইটি মূর্তি আছে, মাতা ও সন্তান। এই মাতা কে ? প্রকৃতি। এই সন্তান কে ? মানব। আমার বোধহয় কোম্‌টি কোথাও এই ব্যাখ্যা দেখাইয়া দেন নাই। —তবে এ দ্বৈত-

বোধ কিসের জন্য ? ঐ দ্বৈতচিত্রের জড় ও চৈতন্যের সহিত কোন দূর সম্পর্ক আছে কি ? তাহা কখনই কোমৃটির মন্তব্য নহে। জড় চৈতন্যের সুসঙ্গত একের পূর্বে অপর নহে। যেখানে তন্ত্রে অদ্বৈত ধারণা হইতে দ্বৈত ধারণার অবতারণা করা হইয়াছে সেখানে এইরূপই আছে। তন্ত্রে জড়েও চিতের ধারণা মাতা ও সন্তান, পুরোবর্তী ও পরবর্তী, স্রষ্টা ও সৃষ্টরূপে করা হয় নাই, ভর্ত্তা ও ভার্যা, পরিধি ও অন্তবর্তী ক্ষেত্র, দুইটি সমবর্তী বস্তুরূপেই ধারণা করা হইয়াছে। তাহার চিত্র এইরূপ—

রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া
মন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাং ॥
নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজেদ্ভগবতীং ভব-দুঃখ-হন্ত্রীম্ ॥

এ মূর্তির চিন্তন কর। এ মূর্তি অদ্ভুতরূপে অতীন্দ্রিয়। তোমার মনে হইবে যে তুমি ঈশ্বরীকে (চিত্রে স্বরূপিনী) দেখিতেছ, কিন্তু বাস্তবিক তুমি কেবল তাঁহার পরিচ্ছদ, তাঁহার অলংকার, তাঁহার ভাবভঙ্গী মাত্র দেখিতেছ এবং তাঁহার জগৎপ্রেমও দেখিতে পাও, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ দেখিতে পাও না। তুমি গতিশীল ও ক্রিয়াশীল যাহা যথার্থতঃ দেখিতে পাও তাহা সেই জড় অংশ। উপরিউক্ত ধ্যানটি অন্নপূর্ণার ধ্যান। কিন্তু অন্নপূর্ণা মূর্তি যাহা দ্বৈত অধিকারীর সুবিধার জন্য—ইহা আদি মূর্তি নহে--এই (তারা পরিবার) সমষ্টির প্রথম মূর্তি ভুবনেশ্বরী মূর্তি, তাঁহার প্রতিরূপে দ্বৈত নাই—অদ্বৈতের ধ্যান নিম্ন-লিখিত রূপ—

উদ্যাদ্দিন দ্যুতিমিন্দুকিরীটাং
তুঙ্গকুচং নয় নত্রয়যুক্তাং।
বরদাং কুশপাশ ভীতিকরাং
সেমরমুখীং প্রভজে ভুবনেশ্বরীং ॥

ইহাতে একটি মাত্র মূর্তি আছে এবং ইহাতে জড়কে চিৎ হইতে পৃথক করিয়া দেখান হয় নাই বলিয়া তুমি ঈশ্বরীর স্বরূপ দেখিতে পাইতেছ। তাঁহার তুঙ্গ কুচযুগ, তাঁহার ত্রিনেত্র, তাঁহার ভীতিকর অস্ত্রধারী ও বরাভয়যুক্ত হস্ত-সকল ও স্মিতমুখ দেখিতে পাইতেছ। হিন্দুধর্মের অনুশীলনে একটি বিষয় ভুলিলে চলিবে না—ইহার নিরঞ্জন অদ্বৈতবাদ (মনিজম) যাহা একেশ্বরবাদ (মনোথিজম) নহে, নিখুঁত ও নিরঞ্জন অদ্বৈতবাদ, ইহার সর্বকালিক দৃঢ় ধারণা—শুধু বিশ্বাস নহে—যে এই ব্যষ্টি জগৎ বিশ্বাত্মায় অবস্থিত এবং সর্ব

প্রত্যেকে আছেন। বহুদিন হইতেই আমি দেখিয়াছি এবং বাস্তবিক আমাকে প্রথমে এই শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছিল যে হিন্দুধর্ম বুঝিবার, উহার ভিতরে ঢুকিবার ইহাই প্রকৃত চাবির স্থানীয় এবং আজ পর্যন্ত এই চাবিটি (অর্থপুস্তক-'কী') আমার নিকট তন্ত্র ও পুরাণের গুপ্ত বিষয়ের ব্যাখ্যায় অপারগ হয় নাই। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম—ভুবনেশ্বরী মূর্তিতে অদ্বৈতচিত্র এবং অন্নপূর্ণা মূর্তিতে দ্বৈতচিত্র উভয়ই পূর্বসৃষ্টির চিত্র। গণপতির নিম্নলিখিত ধ্যানে আমরা সৃষ্টি-কালীন মূর্তি পাইয়া থাকি—

নবরত্নময়ং দ্বীপং স্মরোদিক্ষুরসাম্বুধৌ·· ত্রিনেং

রসাদাশ্লিষ্টং প্রিয়রা সাপদ্মকরয়ী স্বাক্ষস্থয়া সন্তুতং।

তুমি জান যে গণপতি গণেশ ব্রহ্মা-প্রাণ (শক্তি)। কাজেই দেখিতেছ আমরা এখনও প্রকৃতির কথাই বলিতেছি এবং প্রকৃতির যে অংশকে মানব সমষ্টি বলা হয় এবং যাহাকে কোমৎবাদীরা পূজার বিষয় করিতে চান, এখনও তাহার কাছে আসে নাই। অবতার উপাসনায় মানবে ঈশ্বরোপাসনা পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত ধ্যানে আমরা সন্তানের কথা পাই······

নিম্নলিখিত কথাগুলির ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আবশ্যক কি না বলিতে পারি না।

গো-পৃথিবী, গোপ গোপী—পৃথিবীর রক্ষণশীল শক্তিপুঞ্জ। তারপরের ধ্যানটিতে আমরা মানবের সাক্ষাৎ পাই।

উত্তপ্ত হেমসংকাশং, লক্ষ্মীং বামোরুসংস্থিতাং···পদ্মারুণেক্ষণং।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে মনুষ্যরূপী ঈশ্বরের কথা বলিবার সময়ও হিন্দু ঈশ্বরবাদ স্ত্রী পুরুষ জড় চৈতন্যরূপ, সমকালিক দ্বৈতের কথাই আনয়ন করেন। কোমৎ ও খ্রীষ্টধর্মীরা বিভিন্নকাল সংস্পৃষ্ট দ্বৈতের অবতারণা করেন না। আমি আবার বলিতেছি হিন্দুচিত্ত অদ্বৈতভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিষিক্ত।

আরও নামিয়া দেখা যাউক—অনন্তের অতীন্দ্রিয় রাজ্য ছাড়িয়া কালের নিম্নতর স্তরে আসা যাউক। বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চার কথা বিদ্যাদিগের স্তরে বনদুর্গা, সুর-সুন্দরী—প্রভৃতি অনেক সুন্দর ও মনোরম মূর্তি সকলও উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনী, কপাল-মালিনী প্রভৃতি ভয়াবহ ও ভীষণ (যদি ঐ রূপই বলিতে ইচ্ছা কর) চিত্র সকলের সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু এ সব বিষয়ে অধিক কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করি না। গণেশজননী যিনি সর্বকাম-ফলপ্রদা রূপে উপ-বিদ্যাগণের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানীয়া, তাঁহার ধ্যান নিম্নে দিতেছি, ইনি মহাবিদ্যা

নহেন, পরাজ্ঞান ও মুক্তি দান করেন না, অথচ ইনি কোমতের সমগ্র মানব ধারণার সম্পূর্ণ নিকটবর্তী। তাঁহার স্বরূপ এই—

ধ্যায়েদ্ বরাননাং দেবীং লোচন-ত্রিতয়ান্বিতাং·· গণেশজননী দুর্গাং সর্বকামফলপ্রদাং।

আমার বোধহয় নিতান্ত খুঁতখুঁতে আধুনিক রুচিতেও ইহার সম্বন্ধে আপত্তির কিছু থাকিবে না। যীশু-মাতা মেরির মত অবশ্য অংকে স্থিত, আর শিশুকে তিনি স্তন্যদান করিতেছেন, কেবল আদর্শ প্রদর্শন মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। মাতা ও সন্তান—ইহাতে কাল ও পর্য্যায় (একের পর অন্য) রহিয়াছে। তাঁহার সুন্দর দন্তপঙ্‌ক্তি, রমণীয় ওষ্ঠদ্বয় এবং তাঁহার মুখে মাতৃস্নেহপূর্ণ স্মিতহাস্য—যে-মাতৃস্নেহ বিশ্বজীবনের সহায়তাকারী—এ গুলির প্রতি দৃষ্টি কর এবং তুমি দেখিতে পাইবে যে ভারতবর্ষে ইটালির মত চিত্রকরগণ ছিলেন না বলিয়াই গণেশজননীর মূর্তি ম্যাডোনা মূর্তির মত সর্বত্র বিখ্যাত হয় নাই। কিন্তু—কিন্তু আর-একটি বাধা আছে—'ত্রিনয়না'। হিন্দু যে সকল মূর্তিতেই মহান প্রকৃতির উপাসনা করিতেছে, সর্বরূপেই সেই বিশ্বমহানের পূজা এ কথা যে হিন্দু কিছুতেই ভুলিতে পারে না—ঐ ত্রিনয়ন তাহারই নির্দেশ করিতেছে। কিন্তু এই যে ত্রিনেত্র ইহা কি সত্যই সুন্দর নহে? অবশ্য স্ত্রী-জাতির ত্রিনয়ন নাই, কিন্তু নাসিকার মূলভাগে কজ্জল টিপে তাহারা ইহারই অনুকরণ করে নাকি?—ত্রিনয়ন কোনমতে অসামঞ্জস্যকর নহে।

—স্নেহপূর্ণ ভূদেব মুখোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট—গ

ভূদেব ও কয়েকজন লেখক

ভূদেব ও বিদ্যাসাগর

অধ্যাপক প্রথমনাথ বিশী লিখেছেন, 'বিদ্যাসাগর ও ভূদেব সাত বছরের ছোট-বড়, মৃত্যুতেও দুজন তিনবছর আগে-পিছে। দুজনেই পণ্ডিত বংশের সন্তান। দুজনেই শিক্ষাব্রতী। এখানেই মিলের শেষ।···

'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণীর প্রতি বিদ্যাসাগরের অসীম অশ্রদ্ধা, তাহাদের দিয়া দেশের কাজ হইবে না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস বদ্ধমূল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রতি ভূদেবের শ্রদ্ধার অবধি ছিল না, তাহাদের উপরে আশা-ভরসাও রাখিতেন।'

অধ্যাপক বিশীর এই ধারণা সত্য। কিন্তু এই সত্যের অন্য ব্যাখ্যাও করা চলে। 'জীবনবৃত্ত' অংশে সে-চেষ্টা করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর-ভূদেবের বিরোধ বিষয়ে একটি ভুল ধারণার উৎস 'ভূদেব চরিতে' প্রকাশিত (প্রথম খণ্ডে) গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য। ঘটনাটি এই। নর্মাল স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ খালি। ভূদেব একজন প্রার্থী। বিদ্যাসাগর নিয়োগ-কর্তৃপক্ষের আস্থাভাজন। সবে ভূদেবের 'শিক্ষাবিধায়ক' প্রকাশিত হয়েছে। পরের ঘটনা সম্বন্ধে গোবিন্দদেবের বিবৃতি—

'সেই পুস্তকখানি লইয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে গেলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উহা দেখিয়া বলিলেন, 'এই যে ক্লেম দেওয়া হইয়াছে।' ভূদেব বাবু নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদপ্রাপ্তির সুবিধা করার জন্য সত্বরে শিক্ষা সম্বন্ধীয় ঐ পুস্তকখানি লিখিয়া ফেলিয়াছেন, এইরূপ মনে করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্তরূপ দাবি দেওয়ার কথা বলিয়াছিলেন। (পৃ-১৬৮) বিদ্যাসাগর মনু ছেড়ে পরাশর ধরেছেন বলেও গোবিন্দদেব টিপ্পনি করেছেন। 'ভূদেব চরিত' গ্রন্থের আরো আপত্তিকর অংশ—'অল্পকাল মধ্যেই ঐরূপ বিধবা ও ঐরূপ কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক অপ্রচলিত-প্রায় হইয়া লোকের স্মরণপথের অতীত হইয়া যাইবে।'

কিন্তু ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনের সমর্থনে বিদ্যাসাগর বহু পণ্ডিতের যখন দ্বারস্থ হন, তখন বিশ্বনাথ তর্কভূষণের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। তর্কভূষণের অনুপস্থিতিতে ভূদেবের সঙ্গেই আলোচনা ও বিতর্ক হয়। দুঃখের

বিষয় সে-আলোচনার কোন বিবরণ নেই। তখন নাকি ভূদেব বলেছিলেন, বাংলা 'ভাষার উপকার জন্য সমগ্র বাঙালী জাতি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।' কিন্তু অপাত্র কিরূপে সুপাত্র হইয়া পড়িবে? বিদ্যাসাগর—তা বটে।
(ঐ, ১৭৪-৭৫)

এখানেই পিতা-পুত্রের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সুস্পষ্ট। ভূদেবের 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় ভাগের 'স্বাধীন চিন্তা' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের অকুণ্ঠ প্রশংসা আছে। বিদ্যাসাগর ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর তারিখ ভূদেবের ডায়ারিতে উল্লিখিত। বিধবাবিবাহ নিয়ে যেমন উভয়ের মধ্যে গরমিল ছিল, তেমনি বহুবিবাহের বিরুদ্ধে উভয়ের মতের মিলও লক্ষণীয়। যিনি 'দ্বিতীয় দারগ্রহ' অনুমোদন করেন নি, তিনি যে সব অবস্থাতেই বহুবিবাহের বিরোধী হবেন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য দুজনের পথ ভিন্ন হয়। একজন অনিবার্য কারণেই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার চাকরি করতে পারেন নি, অন্যজন শেষদিন পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী সভার উন্নতিশীল কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মিল এই, দুজনের কেউই ব্রাহ্মসভার সদস্য হবার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্র-ভূদেব

এখানে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উল্লেখ করতে হয়। বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর অন্যতর উৎস ভূদেবের অঙ্গুরীয় বিনিময়। এ সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেনের উক্তি স্মরণীয়।* ভূদেবের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' ও 'পুষ্পাঞ্জলি' বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তরে' ও 'আনন্দমঠে' প্রচারিত স্বদেশ-ভাবনারই পূর্বসূত্র। ভূদেব-বঙ্কিম পত্রালাপ (খ-পরিশিষ্টে সংযোজিত) থেকে উভয়ের পারস্পরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধাসম্পর্কের কথা জানা যায়। ভূদেবচরিত ৩য় খণ্ডে আছে, 'কখনো কখনো বঙ্কিমবাবু, হেমবাবু প্রভৃতি আসিতেন। তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধ প্রথমভাগের সংস্কৃত নাটকগুলির বিশ্লেষণ ঐ সময়ের আলোচনার ফল। (পৃ-৩৬৮) অনেকের ধারণা, 'বন্দে মাতরম্' গান রচনামূলেও ভূদেবের প্রভাব সক্রিয় ছিল। কিন্তু ভূদেবচরিত তৃতীয় ভাগে দেখা যায়, 'বন্দে মাতরম্' অর্থাৎ বঙ্গমাতা বন্দনায় ভারতীয়

*'দুর্গেশনন্দিনীর কোন কোন ভূমিকায় অঙ্গুরীয় বিনিময়ের কোন কোন ভূমিকার অসন্দিগ্ধ প্রতিচ্ছবি পড়িয়াছে।' বাংলা সাহিত্যে গদ্য।

সমাজের সংহতি ক্ষুণ্ণ হতে পারে বলে তিনি গানটি খুব পছন্দ করেন নি। পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়কে তিনি বঙ্কিমের প্রিয় দৌহিত্রদের সংবাদ নিতে বলেছেন। বঙ্কিমও তাঁর গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ভূদেবকে পাঠাতেন। মিলের পরিবর্তে গীতা এবং এবং স্থইনবার্নের পরিবর্তে কালিদাস পড়ার যে প্রেরণা বঙ্কিম সীতারাম রচনাকালে অনুভব করেছেন তা হয়ত ভূদেব—প্রভাবেরই ফল।

ভূদেব-চন্দ্রনাথ বসু

চন্দ্রনাথ বসু বঙ্গদর্শনের একজন বিশিষ্ট লেখক, পরে তিনি রক্ষণশীল পত্রিকা 'বঙ্গবাসী' পরিচালনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। চন্দ্রনাথ নিজেই ভূদেবকে 'গুরু' বলেছেন। চন্দ্রনাথের 'কঃ পন্থা' 'হিন্দুত্ব' 'সাবিত্রীতত্ত্ব' 'শকুন্তলা-তত্ত্ব' ভূদেবপন্থী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরই পরিচয়বহ। তাঁর শকুন্তলা নাটক বিশ্লেষণে সনাতন হিন্দুধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি ঘটনা ও দৃশ্যের পর্যা-লোচনা—ভূদেবের উত্তরচরিত রত্নাবলী মৃচ্ছকটিক আলোচনাকেই স্মরণ করায়। ভূদেবের সঙ্গে চন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ যোগাযোগের কথা ভূদেব চরিতে উল্লিখিত হয়েছে। একটি উদ্ধৃতি। ২৩।৪।৯০। 'শ্রীমান চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীমান প্রিয়নাথ ও শ্রীমান উমেশকে আমার বাড়ীতে প্রসাদ পাইতে আসিতে বলিলাম।' (ভূদেব চরিত৹ ৩য় খণ্ড, পৃ-৩০৩) সামাজিক প্রবন্ধ প্রকাশের পরে ভূদেব সারদাচরণ মিত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং চন্দ্রনাথ বসুকে পাঠিয়েছিলেন। চন্দ্রনাথের তত্ত্বব্যাখ্যার প্রবণতা অনেকটা ভূদেবের নাট্যনাম ও চরিত্র নামের তত্ত্বব্যাখ্যার সঙ্গে তুলনীয়। তবে ভূদেবের তন্ত্র-জ্ঞানের ভিত্তিভূমি চন্দ্রনাথের ছিল না। তিনি গুরুর তুলনায় অনেক বেশী সনাতনপন্থী। 'চন্দ্রনাথের সংযম-শিক্ষা, গার্হস্থ্য পাঠ ও গার্হস্থ্যস্বাস্থ্যবিধি ভূদেবের সামাজিক প্রবন্ধ-পারিবারিক প্রবন্ধ প্রভৃতির সরলীকরণ। 'বর্ণভেদ ও জাতীয় চরিত্র' প্রবন্ধটিও ভূদেবের সিদ্ধান্ত অনুসারী। ১৮৮২ সালে বেঙ্গল লাইব্রেরীর পক্ষে সরকারে প্রেরিত বাংলা গ্রন্থের বিবরণে চন্দ্রনাথ বসু ভূদেবের সামাজিক প্রবন্ধের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন।*

ভূদেব-অক্ষয়চন্দ্র সরকার

অক্ষয়চন্দ্রের 'সনাতনী' গ্রন্থ এবং 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা' 'হিন্দুর পরিণয়প্রথা' ইত্যাদি ভূদেবের চিন্তাধারা অনুসারী।

Return of Bengali Books, 1882 by C. Bose.

দুজনেই হুগলী চুচুঁড়ার লোক, পরস্পর পরিচিত। পূর্বেই বলা হয়েছে, বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যাদের কাছে পাঠাবার নির্দেশ ছিল, তাদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র অন্যতম। ভূদেব ও অক্ষয়চন্দ্রের জাতীয়ভাব তুলনীয়। বিধবাবিবাহ (১৮৫৬) ও সহবাস সম্মতি আইন (১৮৯১) নিয়ে সেকালে তুমুল আন্দোলন হয়েছিল। অক্ষয়চন্দ্র দুটি আইনেরই বিরুদ্ধে সাধারণীতে প্রবন্ধ লেখেন। ভূদেবও এই দুই আইনের বিরোধী ছিলেন। ইংরেজ প্রশাসন আমাদের স্বজাতি, স্বধর্ম এবং লোকাচারের উপর হস্তক্ষেপ করছে এই ধারণা থেকে অনেকে বিদেশী দ্রব্য বর্জন করেন। ভূদেব ও অক্ষয়চন্দ্র জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই বর্জননীতি মেনে চলেছেন। অসহযোগ আন্দোলন এর অনেক পরবর্তী ঘটনা।

জর্জ ক্যাম্বেলের ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট এবং অন্যান্য দমনমূলক আইন প্রবর্তনে এবং শিক্ষাধিকার সংকোচনে ভূদেবের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। সে কথা অন্যত্র বলা হয়েছে। অক্ষয়চন্দ্রও একাধিক প্রসঙ্গে ক্যাম্বেলের নিন্দা করেছেন। প্রসঙ্গত বঙ্কিমের 'স্যার জন গ্রে ও সার জর্জ ক্যাম্বেল' তুলনীয়।

এডুকেশন গেজেটে (১৮ই বৈশাখ, ১২৯৩) লেখা হয়েছিল: 'শ্রীকৃষ্ণের একটি বিশেষ ঐশী শক্তি মূর্তিমতী করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে ঐশী শক্তিটি কোন পার্থিব পাত্রে কোন দেশের কোন কবি কর্তৃক কখনো ধৃত হয় নাই।...ঐ ঐশীশক্তির নাম নির্লিপ্ততা। শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যরূপী নির্লেপ।' অক্ষয়চন্দ্র 'বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম' প্রবন্ধে এই অংশ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, কৃষ্ণের নির্লেপতত্ত্ব ও অদৃষ্টবাদ একসূত্রে গ্রথিত। এ ছাড়া, অক্ষয়চন্দ্রের অনেক রচনায় এডুকেশন গেজেট ও মনীষী ভূদেবের উল্লেখ আছে।

ভূদেব-পূর্ণচন্দ্র বসু

পূর্ণচন্দ্র বসুর জীবনকথা বিশদ জানা যায় না। চব্বিশ পরগণার বারাসতের মহেশ্বরপুরে ১৮৪৪ সালে পূর্ণচন্দ্রের জন্ম। গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে (ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী) এবং হিন্দু স্কুলে তাঁর শিক্ষা। ষোল বছর বয়সে (১৮৬০) প্রবেশিকা পরীক্ষা। প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিলাভ। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময়েই বন্ধুদের সঙ্গে মিলিতভাবে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ (১২৭০)। তার পূর্বেই ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে সংযোগ। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতেই কলেজ ত্যাগ ও শিক্ষকতা গ্রহণ। স্কুল পরিদর্শকের পদে উন্নতি। কর্মত্যাগ ও জি, পি, ও-তে চাকুরি গ্রহণ। (জন্মভূমি, ১৩০৫)

পূর্ণচন্দ্রের সাহিত্য চিন্তা (১৩০৩) দেবসুন্দরী (১৩০৪) সমাজতত্ত্ব (১৩০৮)

বই তিনটিতে প্রাচীন আর্যধর্ম, বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ প্রভৃতির সমর্থন এবং আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে এই প্রাচীন ভারতীয় সমাজবিধির স্খলনে-পতনে গভীর আক্ষেপ বিশেষ লক্ষণীয়। তাঁকে অনেকাংশে ভূদেবের উত্তরসাধক বলা যায়। 'সমাজতত্ত্ব' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে:

'প্রাচীন হিন্দু সমাজ যে উচ্চাদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই আদর্শের প্রতি লোকলোচনের দৃষ্টি ফিরান এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমান হিন্দুসমাজ হাজার ভ্রষ্টাচারে পরিপূর্ণ ও কলংকিত হউক, তথাপি তাহার ধর্মনৈতিক আদর্শের বিশদ মূর্তি সকলের মনে জাজ্বল্যমান হওয়া উচিত। সাধু ও সজ্জনগণ সেই মূর্তি দেখিয়া নিজ নিজ পূর্ণপথে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। ...সাহিত্যচিন্তায় আমি হিন্দু সমাজের যে রূপ উচ্চনীতি প্রদর্শন করিয়াছি, এই গ্রন্থের বিষয়ালোচনায় দেখাইয়াছি, সেই নীতি শুধু যে উচ্চ এমত নহে, তাহা সার্বভৌমরূপে সর্বমনুষ্য সমাজের মূল ভিত্তি।'

'সাহিত্যে খুন' প্রবন্ধে রামায়ণ-মহাভারত ও শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডি-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, পূর্ণচন্দ্রের সমাজ-ইতিহাস চেতনা ভূদেবের মত ব্যাপক ছিল না। তাই য়ুরোপীয় সভ্যতার সমালোচনাকালে ভূদেব যে-পরিণত যুক্তিবাদের পরিচয় দিয়েছেন, পূর্ণচন্দ্রে তা অনুপস্থিত। তবু প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য-আবিষ্কার এবং সেই আলোকে সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাখ্যা-অনেকাংশে ভূদেব-গঠিত মানস পরিমণ্ডলের প্রভাব-জাত।

ভূদেব-পদ্মনাথ বিদ্যানিধি

পদ্মনাথ যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পরিচয় পত্র নিয়ে গৌহাটি চাকরি করতে যান, এ বিষয়ে তাঁর স্বীকারোক্তি 'জীবনবৃত্ত' অংশে উদ্ধৃত হয়েছে। পদ্মনাথের 'সশ্রদ্ধ বিবৃতি'—'গ্রন্থ হইতে গ্রন্থকার বড়—ভূদেবের গ্রন্থাবলী অপেক্ষা স্বয়ং ভূদেব আমাদের নিকট সমধিক আদরের পাত্র। তাঁহার জীবন আমাদের নিকট আদর্শ স্থানীয়।'...

'আজকাল এমন দেখা যায়, অনেকে বড় বড় কথা বলেন, কিন্তু কাজের সময় ঐসব ভুলিয়া যান, কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য নাই। ভূদেববাবু সেই প্রকৃতির ছিলেন না। তাঁহার 'পারিবারিক প্রবন্ধ' ত নিজের ঘরের কথা বলিলেই চলে। নিজে সদাচারী পুরুষ ছিলেন, 'আচার প্রবন্ধে' তাই স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতেই শাস্ত্রবাক্য সমর্থন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং সুসামাজিক ছিলেন, তাই এত নিষ্ঠার সহিত 'সামাজিক প্রবন্ধ' লিখিয়াছেন।'

(গৌহাটি ব্রাহ্মণ সভায় ২৩শে বৈশাখ, ১৩২৯ পঠিত এবং ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ এডুকেশন গেজেটে ভূদেব স্মৃতি নামে মুদ্রিত।)

এ ছাড়া তিনি লেখেন— জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সালে 'পুণ্যশ্লোক ভূদেব স্মৃতি'— (এ. গে ১৩২৮ শ্রাবণ—নব্যভারতে 'ভূদেব স্মৃতিপূজা,' ১৩৩২ আষাঢ়, ব্রাহ্মণসমাজে—'ভূদেব মুখোপাধ্যায়,' ১৩৩১ মাঘে 'ভূদেবের-ভুল,' এ. গে) ১৩৫৫ আশ্বিনে—ভূদেববাবু ও রাজনারায়ণ বসু, ১৩৩৫ অগ্রহায়ণে বিলাত যাওয়া সম্বন্ধে 'ভূদেববাবুর মত', শিক্ষাসেবক ১৩৩৫ মাঘ—'ভূদেববাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত।' পদ্মনাথ ভাবনা-চিন্তায় ভূদেবের অনুসারী। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ভূদেবের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। এমন কি তাঁর দুটি প্রবন্ধে মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধেও গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। প্রবন্ধাষ্টক (১৩১৭) হিন্দুবিবাহ স ংস্কার (১৩২১) বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তিনিরাস (১৩২১) প্রভৃতি গ্রন্থে লেখকের শাস্ত্রপাণ্ডিত্য ও স্বধর্ম-নিষ্ঠার পরিচয় আছে।

ভূদেব-গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বঙ্কিম-তারাপ্রসাদ-অক্ষয়চন্দ্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ, তেমনি ভূদেবের অনুগত শিষ্য। ভূদেবের নিষ্ঠা, ঐতিহ্য প্রীতি, স্বাদেশিকতা, দৈনন্দিন জীবনে সরলতা, বর্ণাশ্রমে আস্থা তাঁর পুত্ররা ছাড়া বোধহয় মনে-প্রাণে একমাত্র গুরুদাসই মেনে চলতেন। গুরুদাসের লেখা প্রথম প্রবন্ধ '*Abused India Vindicated*'—থেকেই ভূদেব-প্রভাব লক্ষিত হয়। চূড়ান্ত পরিণতি 'জ্ঞান ও কর্ম' গ্রন্থে। এ বিষয়ে 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' বই থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করা হয়েছে। তাছাড়াও ইংরেজি প্রবন্ধে অধ্যাপক বিনয় সরকার লিখেছেন :

'Banerjee as Educationist, Philosopher and Sociologist has many affinities with Bhudev and represents somewhat the next stage in evolution on the lines developed by the latter.

'He (Guroodas) hardly went bevond the fundamental promises of Bhudev Mookerjee, the exponent of Manu and Jajnavalka as adapted to a certain extent to the ninenteenth century conditions.'

ভূদেব-হেমচন্দ্র

'জীবনবৃত্ত' অংশে খিদিরপুরের যোগেন্দ্রচন্দ্র এবং হেমচন্দ্রের সঙ্গে ভূদেবের

ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কথা উল্লিখিত হয়েছে। হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যায় যোগেন্দ্রচন্দ্র-ভূদেব-অক্ষয়ের (সরকার) আলোচনার মিলিত ফল সমাহৃত। হেমচন্দ্রের স্বদেশবিষয়ক কবিতা, ইলবার্ট বিল ইত্যাদি রাজনৈতিক বিষয়ের কবিতায় ভূদেবের স্বদেশ-ভাবনার সাদৃশ্য মেলে। ভূদেবচরিতে একাধিকবার হেমচন্দ্রের প্রসঙ্গ আছে। একবার হেমচন্দ্র ভূদেবের কাছে উমার ধ্যানমন্ত্র প্রার্থনা করেন—'ধ্যানটি যেন উমার শিশুক্রোড়ে জগৎ-জননীরূপে আবির্ভাবের উপযুক্ত হয়।' (৯ই নভেম্বর, ১৮৮২, ভূদেবচরিত। ৩য় খণ্ড, পৃ-২৯৩) ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পত্রটি দীর্ঘ হলেও অন্যত্র উদ্ধৃত হয়েছে। পত্রে বিবৃত সেকালের কোঁত-পন্থীদের মানবতাদেবী, ম্যাডোনা, মাতা মেরী বনাম গণেশজননী উমার ভাবনা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

ভূদেবের স্বদেশপ্রীতির একদিকে ইংরেজ-বিরূপতা, অন্যদিকে ঐতিহ্যভ্রষ্ট স্বদেশবাসীর জন্য বেদনা, হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত' ও 'ভারতবিলাপ' অনুরূপ স্বদেশভাবুকতার বাণীবহ। হেমচন্দ্র-যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রমুখের যে কোঁত-পন্থী গ্রন্থপঞ্জী সংকলিত হয় (*Positivist Library*) তা অনেকাংশে ভূদেবের প্রভাব-সঞ্জাত।*

ভূদেব-রবীন্দ্রনাথ

'সাহিত্যচিন্তা' অংশে ভূদেব-কৃত রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা উল্লিখিত হয়েছে। 'ভূদেবচরিতে' ধৃত কবির একাধিক পত্রে ভূদেবের সমাজচিন্তা ও জাতীয়তাবোধের ভূয়সী প্রশংসা আছে। রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলা,' 'সারস্বত সম্মিলন,' 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্' প্রভৃতি স্বদেশী ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সেই সূত্রে এবং অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের মাধ্যমেও রবীন্দ্রনাথ ভূদেবের জীবন ও স্বদেশসাধনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, অনুমান করা যায়। 'স্বদেশী যুগে'র রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর সঙ্গে ভূদেবের জাতীয়তাবোধের গভীর ঐক্য আছে।

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ পাঠের পর ভূদেব-শিষ্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তির প্রতিবেদন এখানে উদ্ধারযোগ্য: 'তিনি বলিলেন, প্রবন্ধের বিষয় তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক ভাগ সর্ববাদিসম্মত, যথা—রাজদ্বারে আবেদন করার অপেক্ষা আত্মনির্ভরের প্রতি লক্ষ্য স্থির করা উচিত, বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিব দেশে সঞ্চয় করিব ইত্যাদি। দ্বিতীয় ভাগ…এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহা আমি ভালো করিয়া চিন্তা করি নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমি সুস্পষ্টভাবে স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে পারিনা। সমাজপতি-

নির্বাচন প্রভৃতি বিষয় এই শ্রেণীর। তৃতীয় ভাগ···প্রবন্ধকার মেলার কথা সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের আভাস দিয়াছেন, কিন্তু তাহা খুব সুস্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। কোনো ব্যক্তি একটি দেশ গজকাঠি লইয়া মাপিতে যান। প্রত্যেকটি স্থান, তাহার ভৌগোলিক সংস্থান, ইতিহাস প্রভৃতি তাঁহার নক্সায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইনি বৈজ্ঞানিক। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি সে-সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচিত্র তত্ত্বের দিকে না যাইয়া হয় তো একটি টিলার উপর দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি সংকেতে দূর হইতে দেখাইয়া দেন, সেই আভাসে সমগ্র দেশটির একটি সংক্ষিপ্ত ও জীবন্ত চিত্র দর্শকের চক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইনি কবি। বৈজ্ঞানিক যেরূপভাবে আমাদের অভাব···অভিযোগের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথা বলিয়া উপায়গুলির ক্ষুদ্রতম বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইতেন রবীন্দ্রনাথ তাহা না করিয়া তাঁহার অপূর্ব প্রতিভার সংকেতে যেন একটি চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন।

আমরা বিদেশমুখী ছিলাম, এখন স্বদেশমুখী হইব, কেন্দ্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্বদেশ বিদেশ দুইই আমরা পাইব। অন্ধ কেন্দ্রাভিমুখী গতি আমাদের কল্যাণকর নহে। ধূমকেতুর ন্যায় কেন্দ্রবিচ্যুত হওয়া ভালো নহে। সৌর জগতের গ্রহাদির মতো কেন্দ্রের অধীন হইয়া আমাদের গতি রাখিতে হইবে।'

স্থূলাক্ষর বাক্যটি স্বদেশীসমাজের সংকল্পবাক্য, ভূদেবের 'সমাজচিন্তা' অংশে উদ্ধৃত। ইংরেজের কারিগরী জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ ও স্বসমাজের বৈশিষ্ট্য-রক্ষা—এই সংকল্পেরই প্রস্তাবনা। 'স্বদেশী সমাজে'র পরিশিষ্টরূপে রচিত 'অপর পক্ষের কথা' প্রবন্ধে 'কোনো বন্ধুর লেখা হইতে' রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেছেন···

'স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বদেশপ্রীতির বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। দুই-তিন বার কন্‌গ্রেস হইবার পর একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে কংগ্রেস সম্বন্ধে অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, 'ভারতবর্ষ একটা মহাদেশ, এই মহাদেশের অন্তর্গত প্রত্যেক বিভাগের নেতাগণের যত্নে যদি সমস্ত দেশ মিলিত হইতে পারে, তাহা হইলে এক মহাজাতির অভ্যুত্থান কল্পনা করিতে পারি বটে, কিন্তু বর্তমান কন্‌গ্রেস-ওআলাদিগের দ্বারা যে তাহা সংসাধিত হইবে না তাহা নিশ্চয় বলা যায়। ইহাদের উদ্যম-আলোচনা-আন্দোলনের ফলে চাই কি আমাদের অনেক অভাব-অবিচার দূর হইতে পারে, কিন্তু রাজার নিকট সুবিচারপ্রাপ্তি কিংবা দুই-একস্থলে রাজার সহিত সমান অধিকারপ্রাপ্তিই যদি কন্‌গ্রেসের লক্ষ্য হয় তাহা

হইলে কন্‌গ্রেসের উদ্দেশ্য যে অতি ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ও অদূরদর্শী তাহা বলিতে বাধ্য হইব। কন্‌গ্রেসওআলারা যদি সুসজ্জিত পট্টাবাসের পরিবর্তে হোগলার চালা, চেয়ারের পরিবর্তে কেবলমাত্র মাদুর, পেণ্টলুনের পরিবর্তে ধুতি, এবং ইংরাজির পরিবর্তে ভারতবর্ষীয় ভাষার ব্যবহার করিতে সংকুচিত হয়েন তাহা হইলে বর্তমান কন্‌গ্রেস দ্বারা দেশের কোনো স্থায়ী উপকার সম্ভবপর নহে।'

শোনা কথা কিছু পরিবর্তিত হলেও ভূদেবের বক্তব্যের মূল ভাবটি অবিকৃত আছে এবং তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনের সম্পূর্ণ সায় আছে বলেই তিনি প্রতিবেদনটি গ্রহণ করেছেন। 'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থে মার্কণ্ডেয় মুনির দৃষ্টিতে ভারত-দর্শন এবং 'উনবিংশ পুরাণ'-এর অধিভারতী দেবী-কল্পনার সঙ্গে আত্মশক্তি ও সমূহ এবং স্বদেশী সমাজ—প্রবন্ধাবলীর রবীন্দ্রনাথের চিন্তাগত সাদৃশ্য গভীর অভিনিবেশ দাবি করে।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চিন্তা রবীন্দ্রনাথেরই সুদীর্ঘকালের মনন-অনুশীলনের ফল। তবু রবীন্দ্র-ব্যাখ্যাত 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' যে অনেকাংশে ভূদেব-চিন্তারই উত্তরসাধনা—এটিও সানন্দ কৌতূহলের বিষয়।

1. Patriotic Advocate of Vernacular Education

···Though aware of the advantages of learning English, Bhudev always exhorted Bengali youths to learn Sanskrit and Bengali. He wanted Bengali particularly to be seriously cultivated in all colleges, this vernacular could not be improved if students were merely asked to translate a few Sanskrit passages into Bengali. His sentiments on Presidency College, who is reported to have remarked : 'Bhudev with his C. I. E. and 1,500 a month is still anti-British.' The displeasure of Tawney could not, however, frighten the Patriot into abandoning his pro-Indian views on vernacular education.

2. A Critic of Government

Bhudev had no illusions about the fact that the British Government existed in India solely in the interests of Britain. But he was bold enough to point out the necessity of reducing expenditure on the army.···He was a severe critic of the system of indigo plantation in Bengal. The oppressive methods of indigo cultivation imposed upon the Ryots by the European planters were graphically described by him in his 'History of Bengal' 3rd part : European officers were criticized by him for their working in collusion with the greedy and unscrupulous indigo planters. Fortunately, the Germans found out an ersatz for indigo, otherwise the European planters would have continued their oppressive system in India. Bhudev, thus, once pithily remarked to a European : 'The tears of the Bengali ryots have crystallized in the German laboratories.'

(From Nirmal Sinha : Freedom Movement in Bengal, P. 189-194)

নির্দেশিকা

অগস্ত কোঁত ২১, ২৩, ৪৫, ৪৭, ৫৯, ১১৭, ১১৮, ১২৬

অক্ষয় কুমার দত্ত ৫, ১৬, ২৭, ৫১

অক্ষয় চন্দ্র সরকার *iii*, ১৯, ২০, ২২, ৭০, ৭১, ৭৩

অক্ষয়চন্দ্রের সাধারণী ২৩

অনঙ্গমোহন কাব্য ১২৯

অবকাশরঞ্জিনী ৭০

অষ্টবিংশতি তত্ত্ব ৬০

আওয়ার জয়েণ্ট ফ্যামিলি অরগানাইজেশন ২৬, ৪৬

আচার প্রবন্ধ ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৭৪, ১১৮, ১২০

আলেকজাণ্ডার ডাফ ২২

আর্কিমিডিস ৩৮

আন্‌টনাইনস ৩৮

অঙ্গুরীয় বিনিময় ১৩০

অভিজিৎ মিত্র ১

অ্যাশ্‌লে ইডেন ১৮, ২০

ইউনাইটেড নেশানস্‌ ২৪

ইউটিলিটারিয়ানিজম এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া ৬০

ইউলিসিস ৩৯

ইংলণ্ডের ইতিহাস ১১৫

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *iii*, ৫৫

ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাসংগ্রহ ৮২

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর *(iv)*, ৭, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২২, ২৬, ৭০, ৭৫, ৭৯, ৮১

ইলিয়াস ৩৯, ১২২

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৭১

উও ইয়ে হায় ৩২, ৩৭

উপনিষদ ৫৭

উত্তর চরিত ৭৫, ৭৯, ৮১, ৯৩, ৯৪, ১১১

উদ্বাহসংস্কার ৪১

এ প্ল্যান ফর দি সায়েন্টিফিক ওয়ার্কস নেশেসারি টু রি-অরগানাইজ সোসাইটি ৬০

একান্নবর্তী পরিবার ২৬, ৪২, ৪৬

একান্নবর্তিতা ৪২

এ ট্রিটিজ অফ হিউম্যান নেচার ৬৮

অ্যান এসে কনসারনিং হিউম্যান আণ্ডারস্টাণ্ডিং ৬৮

এ্যারিস্টটল ৩৭, ৪৭

ওয়াল্টার স্কট ৬৭

ওয়াইন এইচ. এল. পি ৭৪

কবীর ২১

কলমা ৫৭, ৭১

কলোনাইজেশন ৬৩

কার্লমার্কস ৭৩, ৭৪

কারুকার্য ও শিল্প সম্বন্ধীয় ইতিহাস ৫৭
কার্যকারণ সম্বন্ধ ২৫
কালাচাঁদ চক্রবর্তী ৮
কিশোরীচাঁদ মিত্র ২২
কেপলার ২৮
কোর্স অফ পজিটিভ ফিলজফি ৬০
কোপারনিকাস ৪৭, ৫২
কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,
রেভারেণ্ড ১১৫
কালিদাস ৭৫
ক্রফট ১১৪
ক্ষেত্রতত্ত্ব ১১৫
গডেস অফ হিউম্যানিটি ৫১
গোলাধ্যায় ২৭
গৌরদাস বসাক ১৪
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (*iv*) ১৩৫
গৃহশূন্যতা ৫০
গ্র্যাণ্ট ২০
চার্লস এলিয়ট ১৯
চার্লস ডারুইন ২৮
চন্দ্রনাথ বসু ১১, ১৭, ৫৫, ১০৭, ১৩১
চন্দ্রশেখর দেব ৮
চেঞ্জ এ্যাণ্ড প্রোগ্রেস ২৬
ছুটুরাম তেওয়ারি ১৭
ছোট ইংরেজ ৩২
জগবন্ধু ভদ্র ৬৭
জনসন ৭৮, ৭৯
জন স্টুয়াট মিল ২৮
জয়েন্ট ফ্যামিলি ৫১
জর্জ কুম্ব ২৮
জর্জ ক্যাম্পবেল ২০
জাতিভেদ ২৬
জি. টি. মার্শাল ১৪, ১১৫
জ্ঞান ও কর্ম ১১৭, ১২০
জ্ঞান ও নীতি ২০
জ্ঞানাংকুর ৬০
জ্ঞানেশ চন্দ্র শাস্ত্রী ১২
জেমস্ লঙ, রেভারেণ্ড ২২, ৬০
তন্ত্র ৫৭
তারাচাঁদ চক্রবর্তী ২৮
তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৬৪
দশকর্মবিধি ৫২
দশমহাবিদ্যা ৫১
দাহু ২১
'দার্শনিক প্রবন্ধ' ৫৭
'দি ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া' ৭৩, ৭৪
দীনবন্ধু ৬
'দেবসুন্দরী' ১৩২
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর *i*, ১৩, ১১৪
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৮
দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ১৬
দ্বারকানাথ মিত্র ৫১
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (*iv*)
ধ্রুববাদ ২২, ৫৯, ১১৭
দ্বিতীয়বার বিবাহ ২৬
'দাম্পত্য প্রণয়' ৪২
'ধর্মতত্ত্ব' ১১৭
নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ১১৭
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
নবীনচন্দ্র সেন ৬৮
নাগানন্দ ৮২

নৈষধকাব্য ২
নৃসিংহনারায়ণ ভট্টাচার্য ৭৫
ন্যায়রত্ন ৪৬
নিয়মের রাজত্ব ২৫
নিধিরাম ৭১
পজিটিভিজম্ ২২
পজিটিভিস্ট ক্যালেণ্ডার ১৪, ৬০
পদ্মনাথ ভট্টাচার্য ১১, ১৭, ৫৫
পঞ্চানন তর্করত্ন ৬৪
পজিটিভিস্ট লাইব্রেরি ৬০
পঞ্চব্রাহ্মণ ৫৮
পঞ্চ কায়স্থ ৫৮
পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ ৮০
পুরাণ ৫৫, ৫৭
পুরাবৃত্তসার ১১৫
পারিবারিক প্রবন্ধ ২৫, ৫৪, ৫৭, ১১৮, ১২০
'পুত্র-কন্যা' ৪৪
'পুত্র-বধ্' ৪৪
পূর্ণচন্দ্র বসু (*iv*)
পুষ্পাঞ্জলি ১৩০
পুলিনবিহারী ভাদুড়ী ১৬
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ৫৬
পোপ ২৪, ৭৮
পৌরাণিক অবতারত্ব
প্রত্যক্ষধর্ম ৬০
প্রকৃতির প্রতিশোধ ৮৩
প্রভাত সঙ্গীত ৮৩
প্লেটো ৩৮
প্রমথনাথ বিশী ২০, ১২৯
প্রদীপ সিংহ ৬০
ফতেমা ২৪
ফরবেস ৬০, ৬১
রবীন্দ্রনাথ ৭১, ৭২
রজনীকান্ত গুপ্ত ৭০
রত্নাবলী ৮১, ৮২, ৮৫, ৮৬
রাম সর্বস্ব তর্কভূষণ ২
রামজয় তর্কালংকার ৭, ৪১
রসিক কৃষ্ণ মল্লিক ২৭
রামমোহন রায় ২৭
রামগোপাল ঘোষ ১৪
র‍্যাফেল ১২৫
রাম ৭৫, ৭৬
'রিভাইভাল' *i*
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ২৫
রাজনারায়ণ ১১, ১৪, ১৯
৫৮, ৭৩, ৭৪,
রাধাকান্ত দেব *i*, ১৩, ১১৪
রামগতি ন্যায়রত্ন ১৭, ২০
রামচন্দ্র মিত্র ২৭
রামায়ণ ৩৯, ৭৫, ৮
রামমোহন *i*,
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ৭৩
বাঙ্গালার ইতিহাস ৮৬
রেণেশাঁস *i*, *iii*,
রুশো ২১, ২৩, ৫৯
রুদ্র পাল ৮২
রোম ১১৫
রসমঞ্জরী ৭০
লক ২০, ২১, ২৩, ৫৯
লালবিহারী দে ২৩
লিটারেচার অফ বেঙ্গল ৭১
লীগ অব নেশনস ২৪

লেকি ৫৭
লেভিয়াথান ৬৮
বঙ্কিমচন্দ্র ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৪,
৭৫, ১১৮
বংকুবিহারী দত্ত ১৪,
বঙ্গদেশের কৃষক ২৬
বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার ২৬
বহুবিবাহ ২৬
বদরুদ্দীন ওমর *iii*
বর্ণভেদ, বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত ২৬
বঙ্গদর্শন ২৩, ৭৫
বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদ ২২
বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত ২৬
ব্রজেন্দ্রনাথ ট্রাস্ট ৯
ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ৭৩
বশিষ্ঠ ৭৪
বনওয়ারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬
বীরাঙ্গনা ১২৩
ব্রজাঙ্গনা ৭০, ১২৩
বড়ো ইংরাজ ৩২
বঙ্গবাসী ১৩১
বঙ্গোন্নয়ন ৬৪
বাসবদত্তা ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮
বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ৭৭
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৫
বাঙালী হিন্দুর পরিণয় প্রথা ২৬
বদ্রিনাথ তেওয়ারী ১৭
বায়রণ ৬৭, ৬৮
বাকল ১১৮
বার্কলি ৭২
বাঙ্গালার ইতিহাস ১১৫, ১১৬
বামবোধিনী ৮
বামাবোধিনী ১৩২
বাল্য বিবাহ ৪০, ৪২
বিবিধ প্রসঙ্গ ৮৩
বিবিধ প্রবন্ধ ৭৬, ১৩০
বিবেকানন্দ ১১৯
বিশ্বনাথ তর্কভূষণ ৮, ১৭, ৫৭, ১২৯
বিশ্বনাথ রামায়ণ ৩
বিশ্বামিত্র ৩৪
বিনয় সরকার *v*, ১১৭
বিশ্বনাথ চতুপাঠী ৮, ১৯
বিভূতি বিদ্যাভূষণ ১২
বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ ৭০
বিক্রমাদিত্য ৭১
ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া ৭৩
বিধবার আবার বিবাহ হওয়া
উচিত কিনা ২৬
বীমস ৯৫, ১১৪
বৃত্রসংহার ৬৯
বেঙ্গল ম্যাগাজিন ২৩
বেঙ্গল ভিকৃটোরিয়ানস্ ৬০
বেকন ৫৭
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ২০
বৈজ্ঞানিক ৭৩
ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ৬
ব্রহ্মময়ী দেবী ২
ব্রাহ্মণ সমাজ ৮, ১২, ৫৬
বেথুন সোসাইটি ২২, ২৩
'ভূদেব স্মৃতি' ১৩৪
'ভূদেববাবুর মত' ১৩৪

'ভূদেববাবুর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত' ১৩৪
ভিক্টর হুগো ৭২
ভরত চন্দ্র শিরোমণি ৭
ভবভূতির উত্তর রামচরিত ৭৫ ৮৯
ভারত বিলাপ ১৬, ৬৯, ১৩৫
ভারত সঙ্গীত ১৬, ৬৯, ১৩৫
ভারত মহিলা ২৬
ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা ২৬
ভারতীয় নারীগণের অবস্থা ২৬
ভারতচন্দ্র ৭০
ভারতে মুসলমান ৫৪
ভারতবর্ষে খৃষ্টান ৫৪
'ভূদেবের ভুল' *iii*
ভূদেব নির্বাণ ৯
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১২৪
মুকুন্দ চক্রবর্তী ৫১
মধুসূদন ১১, ১৪, ৬৯, ৭০
মহম্মদ, হজরত ২৪
মহাভারত ৪৯
মহাস্বপ্ন ৭২
মনুসংহিতা ৫৫
মহেশচন্দ্র ঘোষ ৫৮
মধুসূদন দত্ত ১২
মালতীমাধব ৭৯
মনোমোহন বসু ৫৮
মার্শাল ২৬
মম্মট ভট ৬৭, ৭৮, ৭৯
মান্ধাতা ৬২
মিল, ডার্বিন ও হিন্দুধর্ম ২৬
মিলটন ৬৭, ৬৮
মেনেলাউস ৪৯
মেঘনাদবধ ৬৯, ১২৩
'মেথড অফ ইনডাকশন' ৫৭
যযাতি ৬২
যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ২২, ২৬, ৪৬
যোগীন্দ্রনাথ বসু ৫৫
মাইকেল এঞ্জেলো ১২৫
ম্যাডোনা ১২৫
মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ১৩১,
শশধর তর্কচূড়ামণি ৬১
শক্র সংহার ৮২
শকুন্তলা ৮১
শকুন্তলা তত্ত্ব ৯০, ১৩১
শশিশেখর রায়, রাজা ৫৬
শ্যামাচরণ লাহা ১৪
শিক্ষাদর্পণ ১৬, ৯৯
'শিষ্টাচার প্রবন্ধ' ৫
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব ২৫, ৯৯, ১০৩, ১২৯
শিবনারায়ণ ত্রিবেদী ১৭
শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক ৭৪
শিশিরকুমার ঘোষ ১১
শ্রীচৈতন্য ২১
শ্রীহর্ষের রত্নাবলী ৭৪, ৮৬, ৮৭
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ৬৯
শেক্সপীয়র ১১
স্তিমিত প্রদীপে ১৬
'সিস্টেম অফ পজিটিভ লজিক' ৬০
সত্যমেব জয়তে ১৬
সমাজের পরিবর্ত কয় রূপ ২৬
সমাজ বিজ্ঞান ২২, ২৫

সমাজতত্ত্ব ১২, ১৩২
সমাজ সংস্কার ২৬
সহবাস সম্মতি আইন ১৩১
সন্তানের শিক্ষা ১২৫
সর্বেশ্বরবাদ ৫৭
স্বর্ণদী ১২৯
সটক্লিফ ১১৭
এরিখ স্টোকস্ ৬০
সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ১১, ৫৭
স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস ৫৭ ১১০
স্বদেশ মন্ত্র ১৩২
স্বদেশী সমাজ ১৩৫
সতীদাহ ২৩
স্যার সিসিল বীডন ১৩৫
'স্যার জন গ্রে ও স্যার জর্জ ক্যাম্বেল' ১৩২
সাহিত্যে খুন ১৩৩
সামাজিক চুক্তি ২১
'সাহিত্য চিন্তা' ১৩২
সাধারণী ২৩
'সিস্টেম অফ পজিটিভ পলিটি' ৬০
সামাজিক প্রবন্ধ ৪, ৫৭, ৭১, ৮২ ১১৭, ১১৯, ১২০
সীতা ২৬
সীতানাথ তর্কালংকার ১১৭
সীতার বনবাস ১১০
স্ত্রীশিক্ষা ১৪
সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ২০
সেণ্ট সাইমন ২৩, ৫৯
সেন্স অব্ জাস্টিস ৬৩
সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ২৫
সোপেনহাওয়ার ২৩
হরিনারায়ণ সার্বভৌম ৮, ৫৭
হরিনাথ শর্মা ৮
হরলাল রায় ৭০
হবস্ ২১, ২৩, ৫৯
হাণ্টার কমিশন ১৫, ১৬
হাসান মুরশিদ *iii*
হার্বার্ট স্পেন্সার ২৩
হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় ১৩, ১১৪
হিন্দুর পরিণয় ২২
হিন্দুমেলা ৫৮, ১৩৫
হিন্দু জাতি ২৫
হিন্দুর আচার ব্যবহার ২৬
হিন্দু ধর্ম মর্ম ২৬
হিন্দুধর্মরঞ্জিনী সভা *i*
হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা ২৬
হিন্দু পেট্রিয়ট ২৬
হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থা ২৭
হিন্দুর একান্নবর্তী পরিবার ২৭
হিস্ট্রি অফ্ ন্যাশানালিজম ইন ইউরোপ *iv*, ৫৭
হিউম ডেভিড ৫৯
হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থা ২৬
হুগলী মহসীন কলেজ ৭৫
হেমলতা ৭০, ৭১
হেগেল ২৩
হেডনিজম্ ৬৮
হেক্টর বধ ১২২-১২৩
হেমচন্দ্র ১, ১১, ৬৯
হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১৬
ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল *ii*